দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

রাফাল যুদ্ধবিমান এবং বিরোধীদের মিথ্যা অভিযোগ
—পৃঃ ২৩

কংগ্রেসের একাধিপত্যের যুগ শেষ
—পৃঃ ১১

৭১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।। ৩ ডিসেম্বর ২০১৮।। ১৬ অগ্রহায়ণ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com



রাফাল নিয়ে রাজনীতি

কার অভীষ্ট পূরণ?





স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৩ ডিসেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে পার্টির মেলা-মোচ্ছবের স্তরে নামালেন মমতা ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

খোলা চিঠি : ১৯শে জানুয়ারি আসছে দিন, বিজেপিকে চমকে দিন ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

সাম্প্রতিক নির্বাচন বিজেপির স্থানীয় নেতাদের পরীক্ষা ▯ নলিন মেহতা ▯ ৮

কংগ্রেসের একাধিপত্যের যুগ শেষ ▯ ড: নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

নোবেল কমিটির মূল্যায়নেও আন্তর্জাতিক সমীকরণ কাজ করে ▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ১৩

দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য ও গণতন্ত্রের বধ্যভূমি পশ্চিমবঙ্গ ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ১৫

অশান্ত পাঞ্জাব, খালিস্তানি মুখোশের আড়ালে ইসলামি জিহাদ ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ১৭

রাফাল যুদ্ধবিমান এবং বিরোধীদের মিথ্যে অভিযোগ ▯ শৌভিক রাতুল বসু ▯ ২৩

দেশের নিরাপত্তা বানচালের ছক রাহুলের রাফাল ইস্যুতে ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৬

মহাকুম্ভ মহামিলন ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩১

অস্ত্রপূজনের যৌক্তিকতা ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ৩২

হারিয়ে যেতে বসেছে বঙ্গদেশের চর্মশিল্প ▯ চূড়ামণি হাটি ▯ ৩৩

গল্প : প্রভাত পাকড়াশি ও খাই-খাই কার্ড ▯ পার্থসারথি গুহ ▯ ৩৫

গল্প : লাফিং ক্লাব ▯ রঞ্জিত কুমার ভরদ্বাজ ▯ ৩৭

স্বামী বিবেকানন্দর ইতিহাস ভাবনা ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৪১

বাংলাদেশে হাসিনার একনায়কত্বে অভিভাবকহীন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমাজ ▯ রঞ্জন কুমার দে ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ২৯-৩০ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ চিত্রকথা : ৪০ ▯ অন্যরকম : ৪২ ▯ স্মরণে : ৪৫ ▯ রঙ্গম : ৪৯▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৮

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৮

হিন্দু বাঙ্গালির স্বার্থে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল জরুরি

দেশভাগের পর থেকে হিন্দু বাঙ্গালিদের নিয়ে রাজনীতি অব্যাহত। যেহেতু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লোক-বিনিময়ের প্রস্তাব নেহরু মানেননি, তাই দেশভাগ-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসি সরকারের মনোভাব বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙ্গালি শরণার্থীদের প্রতি ছিল বিমাতৃসুলভ। আর বামপন্থীদের কাছে শরণার্থীরা ছিলেন শুধু ভোটব্যাঙ্ক। একই ছবি আমরা দেখি অসম এবং ত্রিপুরাতেও। এই পরিপ্রেক্ষিতে মোদী সরকারের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের রূপায়ণ অত্যন্ত জরুরি। এই বিলে বলা হয়েছে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে যে কোনও হিন্দু-শিখ-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষ ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা হিন্দু বাঙ্গালির স্বার্থে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। লিখবেন— মোহিত রায়, দেবযানী ভট্টাচার্য, রন্তিদেব সেনগুপ্ত প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

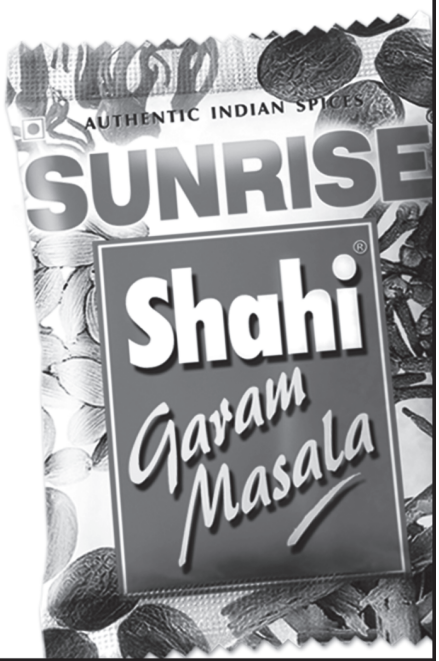

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাহুলের দেশবিরোধী রাজনীতি

রাফাল যুদ্ধবিমান ক্রয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার দুর্নীতি করিয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর ইহাই অভিযোগ। এই অভিযোগেই আসর মাত করিয়া দিবেন—এমন আশা করিয়াই রাহুল গান্ধী প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত নানাবিধ নিত্যনূতন গালগল্প বাজারে হাজির করিতেছেন। এ যেন অনেকটা কানু বিনা গীত নাই। মজার কথা হইতেছে, তিনি বলিতেছেন বটে, কিন্তু শুনিতেছে কে? সকলেই বুঝিয়া গিয়াছেন রাহুলের এবম্বিধ অভিযোগের সারবত্তা কিছুই নাই। রাহুল যে নিতান্তই মিথ্যাচারের আশ্রয় লইয়াছেন—তাহাও সকলেই বুঝিয়াছেন। বুঝিয়াছেন বলিয়াই রাহুল গান্ধীর তথাকথিত বিরোধী জোটের শরিক নেতা-নেত্রীগণ রাফাল প্রসঙ্গে অন্তত রাহুল গান্ধীকে আর সঙ্গ দিতেছেন না। কে-ই বা মিথ্যার ভাগী হইতে চায়? রাজনীতিতে সকলেই যে সদা সত্য কথা কহেন—এমন নয়। অনেকেই রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিতে অণৃতভাষণের আশ্রয় লন। কিন্তু রাফাল প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধীর এই মিথ্যাচার একটি আত্মঘাতী এবং দেশের স্বার্থ বিরোধী রাজনীতিরই ইঙ্গিত করিতেছে। এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক চরিত্রটিও জনসমক্ষে নগ্ন করিয়া দিতেছে।

মনে রাখিতে হইবে, রাফাল যুদ্ধবিমান ক্রয়ের সঙ্গে দেশের নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি জড়িত। রাফাল যুদ্ধবিমান সংক্রান্ত কোনওরকম তথ্য যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে দেশের নিরাপত্তার পক্ষেই তাহা হানিকর হইবে। শুধু রাফাল কেন, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোনও তথ্যই প্রকাশ্য হইয়া পড়া উচিত নয়। রাহুল গান্ধী এবং তাঁহার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস অবশ্য দেশের নিরাপত্তার প্রসঙ্গটিকে গুরুত্ব দিতে আদৌ রাজি নয়। তাঁহারা দাবি করিয়াছেন, রাফাল যুদ্ধবিমানের ক্রয় মূল্য সরকারকে ঘোষণা করিতে হইবে। ফরাসি সরকার বলিতেছে যে, ক্রয় মূল্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলে ভারত এবং ফ্রান্স দুই দেশেরই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্বার্থ বিঘ্নিত হইবে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। চোর যেমন ধর্মের কাহিনি শোনে না, তেমনই রাহুল গান্ধীও দেশে স্বার্থ এবং নিরাপত্তার প্রসঙ্গটিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। শুধু রাফাল নয়, এর আগে সার্জিকাল স্ট্রাইকের সময়ও সেনা অভিযানের ছবি প্রকাশ করিবার দাবিতে রাহুল সরব হইয়াছিলেন। একটি দুধের শিশুও বুঝে, সেনা অভিযানের ছবি প্রকাশ হইয়া পড়িলে ভারতীয় সেনার যাবতীয় রণকৌশল প্রতিপক্ষের নিকট ফাঁস হইয়া যাইবে। সবাই বুঝিলেও, রাহুল গান্ধী দেশের স্বার্থের বিষয়টি বুঝিতে চাহেন না।

রাফাল যুদ্ধবিমান বা সার্জিকাল স্ট্রাইক সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িলে কাহার লাভ? অবশ্যই ভারতের দুই চিরশত্রু প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন এবং পাকিস্তনের। তাহা হইলে এইটুকু অন্তত বুঝা যাইতেছে, ভারতের স্বার্থে নয়, রাহুল গান্ধীর রাজনীতিটি ধাবিত হইয়াছে চীন এবং পাকিস্তানের স্বার্থে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে তাহাদের সমর্থন এবং সহানুভূতি যে রাহুল গান্ধীর পক্ষে, তাহা গোপন রাখে নাই পাকিস্তানও। দেশের স্বার্থ বিক্রয় করিয়া যাঁহারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিতে চান, তাঁহারা কি সত্যই দেশকে নেতৃত্ব দিবার পক্ষে উপযুক্ত?

সুভাষিতম্

সা ভার্যা যা প্রিয়ং ব্রূতে স পুত্রো যত্র নির্বৃতিঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাস স দেশো যত্র জীব্যতে।। (মহা:, শান্তিপর্ব ১৩৫/৯৬)

যে ভার্যা হিতকারী ও প্রিয়বাদিনী হয় তাকে প্রকৃত ভার্যা বলে, যে পুত্র হতে সুখ লাভ সে প্রকৃত পুত্র, যে মিত্র বিশ্বাসের পাত্র সে প্রকৃত মিত্র এবং যে দেশে সুখে জীবিকা নির্বাহ হয় তাকে প্রকৃত দেশ বলা হয়।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে পার্টির মেলা-মোচ্ছবের স্তরে নামালেন মমতা

কলকাতা মহানগরীর সংস্কৃতিবান শিল্পবোদ্ধারা সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুচিবোধের অযথা প্রশংসা করেছেন তাতে অনেকেই অবাক হয়েছেন। অবাক হওয়ারই কথা। কারণ, উদ্বোধন অনুষ্ঠানকেই তিনি তাঁর দলীয় উৎসব করে তুলেছিলেন। পার্টির নেতা-মন্ত্রী- আমলাদেরই নেতাজী ইনডোরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভা আলো করে বসে থাকতে দেখলাম। কবি, সাহিত্যিক, লেখক, প্রবীণ চলচ্চিত্র পরিচালকদের কাউকে প্রথম বা দ্বিতীয় সারিতে বসে থাকতে দেখলাম না। অন্তত টিভির পর্দায়। টিভি আর খবরের কাগজের পরিচালকরা মঞ্চে মমতা এবং বলিউডের তারকাদের দেখাতেই ক্যামেরাম্যানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলা হচ্ছিল যে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় কলকাতায় 'বিশ্ব সিনেমা উৎসব' হচ্ছে।

যেসব সিনেমাপ্রেমী ১০ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলা চব্বিশতম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দেখতে নন্দন চত্বরে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে সিনেমা নয় মমতাকে তুলে ধরাই ছিল প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে মমতার অধীনস্থ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর নন্দন চত্বরেই মুখ্যমন্ত্রীর ৫৭৪টি কাটআউট লাগিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাটআউটে নন্দনের নিজস্ব লোগোটি পর্যন্ত চাপা পড়ে যায়। এই লোগোটির নকশা তৈরি করে ছিলেন সত্যজিৎ রায়। বিদেশি অতিথি এবং চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মনে হতে পারে যে মমতাই এখন ভারতের জনপ্রিয়তম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক। বাস্তব হচ্ছে, মমতা আজ পর্যন্ত সিনেমা বানাননি। অদূর ভবিষ্যতে বানাবেন এমন সম্ভাবনাও নেই। তাই তাঁর অনুপ্রেরণায় কীভাবে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প এগিয়ে যাবে বোঝা যাচ্ছে না। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, মৃণাল সেনদের সময় বাংলা সিনেমা নিয়মিতভাবে বিদেশে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে। আর এখন মমতার অনুপ্রেরণায় মুগ্ধ

গূঢ় পুরুষের কলম

চলচ্চিত্র পরিচালক-প্রযোজকদের একটি ছবিও বিদেশ থেকে পুরস্কার আনতে পারে না। গত ৮-১০ বছরের মধ্যে বিদেশের নামিদামি চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলা ছবি দেখানো হয় না বা হৈচৈ হয় না। সোজা কথায় বলি যে রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের পায়ে তেল দিয়ে ভালো শিল্প সৃষ্টি হয় না। হতে পারে না। মমতার অনুপ্রেরণায় রাস্তা সারাই হতে পারে। মহৎ শিল্প কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে। যোগেন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্নরা প্রশংসায় ধন্য ধন্য করেছেন। তারপর সারদা, রোজভ্যালি কর্তারা জেলে গেলে তাঁরা আর মমতার আঁকা ছবি নিয়ে একটা কথাও বলেন না।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সেমিনারে খ্যাতনামা পরিচালক অনীক দত্ত বলেছিলেন নন্দন চত্বরে মমতার অসংখ্য বড় সাইজের কাটআউটের ছড়াছড়ি দেখে বিদেশি অতিথিরা মনে করতে পারেন যে এই ভদ্রমহিলা সত্যজিৎ রায়ের থেকেও নামজাদা চলচ্চিত্র পরিচালক! অনীকবাবু যে সেমিনারে তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন তার বিষয় ছিল 'কে বড়, ছবির পরিচালক না প্রয়োজক?' অনীকবাবু পরে জানান যে তিনি হাল্কাভাবে মজা করার জন্য কথাটা বলেছিলেন। মোটেই না। অনীক দত্তের ছবি ভবিষ্যতে রিলিজ করতে দেওয়া হবে না এমন হুমকির পর তাঁর অন্য কিছু বলা ছাড়া পথ ছিল না। মনে রাখতে হবে যে, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব তৃণমূল পার্টির সভা নয়। এই উৎসব হয় সরকারি উদ্যোগে ও টাকায়। তাই উৎসবের প্রধান প্রেক্ষাগৃহ 'নন্দন' মুখ্যমন্ত্রীর কাটআউটে পুরোপুরি ঢেকে দেওয়া যায় না। বিশেষত সত্যজিৎ রায়ের আঁকা 'নন্দন' লোগোটি। চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বখ্যাত পরিচালকদের ছবিতে বা কাটআউটে ভরে থাকলে কেউ আপত্তি জানাতো না। সেটাই নিয়ম। এই প্রথম দেখা গেল এমন একজন রাজনৈতিক নেত্রীর ছবি কাটআউটে উৎসব প্রাঙ্গণ ভরে আছে যাঁর সঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পের সামান্যতম সম্পর্ক নেই। রাজ্যের মানুষ জানেন প্রতিটি সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি এবং বিশাল কাটআউট প্রবেশ পথে রাখা বাধ্যতামূলক।

চলচ্চিত্র উৎসবকে আর পাঁচটা 'মা-মাটি-মানুষের' মোচ্ছবের স্তরে টেনে নামানোর কৃতিত্ব মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর এবং তাঁর বশংবদ চাটুকারদের। মুখ্যমন্ত্রী চব্বিশ ঘণ্টা প্রচার পেতে ভালোবাসেন। তাই সব কিছুই তাঁর অনুপ্রেরণায় হয়। জানতে ইচ্ছে হয়, রাজ্যের দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত, নারী নিগ্রহ, চিকিৎসকদের গণপিটুনি সবাই কী তাঁর অনুপ্রেরণা বা উদ্যোগে হচ্ছে? কাউন্সিলার থেকে মন্ত্রী সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা (ধমক বা অপমান) ছাড়া নিজেদের কাজ করতে পারেন না। তাঁর একদা স্নেহের 'কানন' (শোভন চ্যাটার্জি) মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণার ধাক্কায় বেহাল হয়ে মন্ত্রিত্ব, মেয়র পদ সবই ছেড়েছেন। অপেক্ষা করুন। অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণার ধাক্কায় তৃণমূল ছেড়ে বৃক্ষমূলে আশ্রয় নেবেন। ▮

১৯ জানুয়ারি আসছে দিন, বিজেপিকে চমকে দিন

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

জোট হচ্ছে। জোট হবে। কে কে সেই জোটে থাকবে সেটাও বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হচ্ছে জোট। ফেডারেল ফ্রন্ট।

খায় না মাথায় মাখে সেসব চিন্তা না করে একবার ভাবুন কী কী হতে চলেছে। বিজেপি নামক মহাশক্তিকে রুখে দিতেই হবে। দিদিই দেবেন রুখে। আপনারা ভাবছেন স্বপ্ন কিন্তু দিদি চান— বাঘে আর গোরুতে এক ঘাটে জল খাক।

দিদির ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি এবার পুরোদমে শুরু হলো। চার মাস আগে ২১



জুলাইয়ের সভা থেকে ব্রিগেডের কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসবের মরসুম শেষ হওয়ার পরে তিনি ব্রিগেডে সফল করার বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে এই ব্রিগেডকে তিনি 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসাবে দেখাতে চান। সর্বভারতীয় বিরোধী নেতাদের হাজির করে 'বিজেপি হটাও' স্লোগান দিয়ে এখান থেকেই হাওয়া তুলতে চান সরকার বদলের। সুতরাং ১৯ জানুয়ারি আসছে দিন। বিজেপিকে চমকে দিন।

কিন্তু ঘটনা হলো, বিরোধী রাজনীতির ছবি ঘনঘন বদলে যাচ্ছে। জাতীয় ক্ষেত্রেই হোক বা রাজ্য রাজনীতিতে, সেই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে। ফলে ফেডারেল ফ্রন্ট গড়ে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিবিধ জটিলতা ও পার্টিগণিতের কুশলী অঙ্ক।

ক'দিন আগেই কলকাতায় মমতার সঙ্গে বৈঠক করে গেলেন চন্দ্রবাবু। বিভিন্ন রাজ্যে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানোর দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। পাশাপাশি আবার এই কাজে কংগ্রেস তাঁকে ব্যবহার করছে— এমন ধারণাও কম নয়। আসলে বিশ্বাস করা মুশ্‌কিল।

১৯ জানুয়ারি মমতার ব্রিগেড সমাবেশ। শোনা যাচ্ছে নাইডু নিজে তো আসবেনই, রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী শীর্ষনেতাদের যত জনকে সম্ভব, সেখানে উপস্থিত করানোর জন্য উদ্যোগী হবেন, এমন কথাও সেদিন হয়েছে। ঠিক যেমন মমতা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, অন্যান্য রাজ্যে বিরোধীদের সমাবেশে সমাবেশে তিনি হাজির হবেন।

কিন্তু এই রাজ্যের নিরিখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কংগ্রেসকে নিয়ে। অন্য যেসব দল ব্রিগেডের সভায় আসবে, তারা কেউ এ রাজ্যে ভোটে লড়বে না। তাদের উপস্থিতি মূলত বিজেপি-বিরোধী সর্বভারতীয় মঞ্চে যা মমতার গুরুত্ব আরও বাড়বে। আর, ওই মঞ্চে কংগ্রেসের থাকা, না-থাকা হবে রাজনৈতিক ভাবে সবচেয়ে অর্থবহ। কারণ এই রাজ্যে বিজেপি-বিরোধী ভোট ভাগ রুখতে গেলে কংগ্রেসের কিছুটা দায় থাকবেই। কংগ্রেস আসবে কি না, এলে কোন স্তরের নেতা আসবেন এবং প্রদেশ কংগ্রেসের ভূমিকা কী হবে, সব কিছুই এক্ষেত্রে ভাবার। তবে দিল্লির হাইকম্যান্ড কী বোঝেন এবং বোঝান, সেটাই এখন দেখার।

—সুন্দর মৌলিক

সাম্প্রতিক নির্বাচন বিজেপির স্থানীয় নেতাদের পরীক্ষা

অতিথি কলম



নলিন মেহতা

সাম্প্রতিক নির্বাচনী পোস্টারগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজতে গেলে এবারে ছত্তিশগড়ে চমকপ্রদভাবে যা নজর কাড়বে তা হলো প্রচারের অস্ত্র হিসেবে অটলবিহারী বাজপেয়ীর পুনরুত্থান। মধ্য ছত্তিশগড় ও রাজধানী রায়পুরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে অতিকায় সব কাটআউটের সামনের দিকে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিংহের প্রতিকৃতি।

একই মাপের কাটআউটের অন্তরাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বাজপেয়ীর বিশাল প্রতিকৃতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা দলীয় সভাপতি অমিত শাহের উপস্থিতি নির্বাচনী প্রচারপত্রে অবশ্যই জায়গা করে নিয়েছে, কিন্তু তুলনামূলক দৈর্ঘ্যে তা অনেক ছোটো।

সন্দেহাতীতভাবে প্রধানমন্ত্রীই দলের প্রধান ভোটসংগ্রাহক, একইসঙ্গে কার্যকর্তা ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে উদ্দীপনা জাগানোর মুখ্য নিয়ামক। তবুও ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রে বিষয়টা কিন্তু খুব আলাদা। বিজেপি দলের যারা ভারতে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সময়ের শাসন পরিচালনা করার গৌরবের অধিকারী তাদের মধ্যে অন্যতম ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিংহ। এখানে তিনিই কিন্তু দলের ম্যাসকট। তিনি লড়াই করছেন নিজের সুশাসনের রেকর্ড নিয়ে। কিন্তু তাঁর প্রশাসনিক উৎকর্ষের নিদর্শনগুলি সবই অটলবিহারীর অভিধান থেকে নেওয়া বা তাঁকে ছুঁয়ে গড়ে ওঠা। উদাহরণ স্বরূপ, অটল দৃষ্টিপত্র ইংরেজিতে ভিশন ডকুমেন্ট। অমিত শাহের সূচনা করা ডোনাগড় থেকে রমণ সিংহের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয় 'অটল বিকাশ যাত্রা'। আবার যাত্রা নয়া রায়পুরে যখন শেষ হলো তখন তার নাম বদলে হয়েছিল 'অটল নগর'। এগুলি নজরকাড়া সংযোজন। প্রতিবেশী রাজ্য মধ্যপ্রদেশে বাজপেয়ী অবশ্য অনেকটাই অনুপস্থিত থাকলেও শিবরাজ সিংহ চৌহান একজন বড় মাপের নেতা হিসেবে রমণ সিংহকে সেখানে তুলে ধরতে কসুর করেননি। মধ্যপ্রদেশ বিজেপিতে মামাজী হিসেবে জনপ্রিয় শিবরাজ সিংহ চৌহানও কিন্তু ২০০৫ থেকে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে একই ধরনের জনহিতকর প্রকল্পগুলির সাফল্যকে হাতিয়ার করেই নির্বাচন লড়ছেন। অবশ্যই বেরোজগারি তাঁর ক্ষেত্রেও বড় সমস্যা হলেও বিশেষ ধরনের জনমুখী প্রকল্প— গরিবদের ২০০ টাকা (একটি করে বাল্ব, পাখা, এয়ারকুলার চালানোর খরচ বাবদ) দেওয়া হচ্ছে। আগেকার সমস্ত বকেয়া ইলেকট্রিক বিল মকুব করে দেওয়ার সঙ্গে শিশু জন্মালে ১২ হাজার টাকা, পারলৌকিক কাজে পরিবারকে ৫ হাজার টাকা ও উপজাতি পরিবার পিছু ফল ও দুধ বাবদ ১ হাজার টাকার চলতি অনুদানের ওপর শিবরাজ ভরসা রেখেছেন।

এই ধরনের বড় সড় সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে যেমন 'সম্বল যোজনা' প্রভৃতিতে লাগাতার অর্থ বরাদ্দ ও খরচের মাধ্যমে শহুরে গরিব, দলিত ও উপজাতি ভোটদাতাদের পাশে পাওয়ার আশা করছেন তিনি। এর সঙ্গে তাঁর নিজের ওবিসি গোষ্ঠীর হওয়াটা ওই সম্প্রদায়কে কাছে পাওয়ার সহায়ক। এই অস্ত্রগুলি নিয়েই তিনি ১৩ বছরের অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন। ২০১৭ সালে মান্দসৌরে কৃষকদের আন্দোলনের পর তারা এমন দু' ভাগে ভাগ হয়ে রয়েছে। গ্রামীণ মধ্যপ্রদেশের অভ্যন্তরে শিবরাজের মামাজী ভাবমূর্তি ও 'ফুলছাপের' ওপর ভিত্তি করেই বিজেপির প্রচার চলছে। রাজধানী ভোপালে প্রচারের প্রধান মুখ হিসেবে চৌহান ও নরেন্দ্র মোদীর পোস্টারই শোভা পাচ্ছে।

পোস্টার দেখে তা নিয়ে অতিকথন করাটা সোজা বিষয়। কিন্তু তারও একটা অন্তর্লীন ভাষা আছে যা দল নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায়। বিশেষ করে বিজেপির মতো দল বরাবর বিশ্বাস করে এসেছে রাজনৈতিক যোগসূত্র তৈরির ক্ষেত্রে পোস্টারের মধ্যে সূক্ষ্ম বার্তা দেওয়া বা সূক্ষ্মতার অর্থ জনতার মধ্যে চারিয়ে দেওয়া যায়। গত বছরের গুজরাট ও সাম্প্রতিক কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রচারের যে ধারা ছিল এবারের এই দু'টি রাজ্যের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা কিন্তু একেবারে আলাদা।

কর্ণাটকের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রচারসভাগুলির অভিঘাতে শেষদিকে তড়িৎগতিতে ভোট বিজেপির দিকে ঘুরে যায়। অন্যদিকে গুজরাটের নির্বাচন আগাগোড়া নির্মিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর ফেলে আসা উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে। এই নিরিখে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ক্রমশ প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের কার্যকলাপ নির্ভরই হয়ে উঠছে। অবশ্যই নরেন্দ্র মোদী মাথার ওপর 'সর্বেসর্বা' হিসেবেই রয়েছেন, তবুও এবারে দল যেন নির্বাচনী প্রচারকৌশলে তৃণমূল স্তরে বেশ বদল এনেছে।

প্রসঙ্গত, নরেন্দ্র মোদী গুজরাটে ৩৪টি ও কর্ণাটকে ২১টি নির্বাচনী সভা করেছিলেন। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী সদ্য সমাপ্ত ছত্তিশগড় নির্বাচনে তিনি প্রচার সভা করেছেন মাত্র ৫টি। রাজস্থানেও এ পর্যন্ত তিনি সভা করেছেন একটি (অবশ্যই আরও অনেক হবে)। মধ্যপ্রদেশে তাঁর মোট ১১টি সভা করা নির্ধারিত আছে।

অন্যদিকে, বিজেপির প্রচারের পুরোধা পুরুষ হয়ে দেখা দিয়েছেন দলীয় সভাপতি অমিত শাহ। এযাবৎ ছত্তিশগড়ে সভা করেছেন ১০টি, মধ্যপ্রদেশে ১৪টি (আরও বাকি) আর রাজস্থানে সম্পন্ন হয়েছে ৩টি (আরও বাকি)।

এর বিপরীতে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী কিন্তু পরিভাষায় বোমাবর্ষণ করে চলেছেন। শাহ-মোদী দু'জনে ৪৩টি সভা করলে তিনি এ পর্যন্ত (ছত্তিশগড়ে ১৮, মধ্যপ্রদেশে ১৯ ও রাজস্থানে ৬টি সভা) একাই তাঁদের ছুঁয়ে ফেলেছেন।

হিন্দি বলয়ের অন্যতম গড় হিসেবে এই তিনটি রাজ্যে রয়েছে ৬৫টি লোকসভা আসন। গত ২০১৪ নির্বাচনে রাজ্যগুলি বিজেপিকে সাংসদ দিয়েছিল ৬২ জন। সেই কারণে এই রাজ্যগুলির নির্বাচনী ফলকে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের যে সেমি ফাইনাল বলে ধরা হচ্ছে তা অযৌক্তিক নয়। অন্য ভাবে ধরলে এটা আবার অতি সরলীকরণ হয়ে যায়। সেমি ফাইনালের যে তকমাটা লোকসভা নির্বাচনের আগে দেওয়া হয়েছে, তার কারণ লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস-বিজেপির সরাসরি সম্মুখ সমরের বড়ো লড়াই আর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নির্বাচনী প্রচারের চরম অবস্থায় প্রচারের বিষয়বস্তু একেবারে জাতীয় স্তর ছাড়িয়ে রাফেল অস্ত্র চুক্তির মতো আন্তর্জাতিক মাত্রার চূড়াও স্পর্শ করছে। আবার সিবিআই বনাম সিবিআই বা একচেটিয়া শাসক ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিদের প্রশ্রয়দান (Crony Capitalism)-এর অভিযোগ যেমন এক পক্ষ থেকে উঠছে ঠিক তেমনি 'নামদার' এর সঙ্গে 'ইমানদারের' লড়াইয়ের কথাও প্রচারসভা আলোড়িত করছে। ফলস্বরূপ এই কটি রাজ্যের নির্বাচন আদতে সেই মোদী বনাম রাহুল হতে চলেছে। পরিণতিতে এর ফলাফল প্রকাশিত হলে তা মোদী ম্যাজিকের জনমানসে টিকে থাকার ক্ষমতার পরীক্ষা বা জাতীয় জীবনে জনতার নতুন কিছু পরখ করার ইচ্ছের সূচনা হলো কিনা তাই প্রমাণ করবে।

ছত্তিশগড়ে বাজপেয়ীকে যেভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে তাঁর পুনরুত্থানের ওপর বিশেষ ভরসা রাখা হচ্ছে তাতে একটু হলেও মনে হতে পারে যে, এবারের এই বিধানসভা নির্বাচনটি কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর জনতার সঙ্গে সংযোগ নির্ভর নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে মনে হয় হিন্দিভাষী গড়ের এই নির্বাচনগুলি ভারতের রাজনৈতিক দাবার বোর্ডে মোদীর কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতরণের আগের জমানার চিরাচরিত ধাঁচে পরিচালিত হচ্ছে।

এবারের নির্বাচনের মূল ভরকেন্দ্রে চলে এসেছেন স্থানীয় মুখ্যমন্ত্রীরা। জনতার অধিকারে থাকছে তাদের কাজকর্ম, সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান। নিজ অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত তথ্যের মূল্যায়ন করেই তাঁরা ভোট দেবেন। ছত্তিশগড়ে ৫০ লক্ষ স্মার্ট ফোন বিলি করা বা মধ্য প্রদেশে পরিবারের রোজগেরে সদস্য মারা গেলে ৪ লক্ষ টাকা এককালীন ক্ষতিপূরণ বা রাজস্থানের 'ভামাশা' প্রকল্পে উপভোক্তার খাতায় সরাসরি টাকা জমা করে দেওয়ার প্রসঙ্গগুলিই প্রচারসভায় আলোড়ন তুলছে। রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীদের চালু করা জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্পের বিপুল খরচ ও তজ্জনিত নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তিই এবারের তুরুপের তাস। তাই আবারও বলছি কংগ্রেসের আগ্রাসী প্রচারের বিপক্ষে জনপ্রিয় নেতা ও তাঁদের প্রকল্পের সাফল্যই এবারের বিজেপির নির্বাচনী মডেল। মোদীর ওপর গণভোট কখনই নয়।



"এই কটি রাজ্যের নির্বাচন আদতে সেই মোদী বনাম রাহুল-এ পরিণত হয়েছে। পরিণতিতে এর ফলাফল প্রকাশিত হলে তা মোদী ম্যাজিকের জনমানসে টিকে থাকার ক্ষমতার পরীক্ষা বা জাতীয় জীবনে জনতার নতুন কিছু পরখ করার ইচ্ছের সূচনা হলো কিনা তাই প্রমাণ করবে।"

রম্যরচনা

পল্টু বাড়ি ফিরতেই পল্টুর বউ ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল— দেখেও কি শিখতে পারো না? পল্টু অবাক। জিজ্ঞেস করল— কী শিখব?

বউ—কেন, কাগজে পড়ছ না? প্রেমের জন্য সব কেমন ত্যাগ করল। সংসার, রাজনীতি, পদ, ক্ষমতা—সব।

পল্টু বিরক্ত হয়ে বলল—আরে রাখো তো। পরের বউ পেলে আমিও ওরকম করতে পারি। নিজের বউয়ের জন্য করুক আগে, তাহলে বোঝা যাবে।

পল্টুদের বাড়িতে এখন এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে এসেছে।

* * *

শোনা গেল উনি নাকি আবার কবিতা লিখছেন। কবিতাটি হলো—

শোভন দ্রবণ নলবন
চলে যা তোরা।
বৈশাখী পাকাপাকি মাখামাখি
যা বলে বলুক ওরা।।
রত্না সৎ না মত না
দিলে দিক ওরে।
পাতিহাঁস হালিঘাস ইতিহাস
হবিই ওরে ধরে।।
আশীর্বাদ আর্তনাদ বরবাদ
সুখে থাক তোরা।।



উবাচ



“২৬/১১-র মুম্বই হামলার মাথারা পাকিস্তানে প্রকাশ্যে শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে না, ভোটেও লড়ছে। তাদের খবর দিলে ৩৫ কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।”

মাইক পম্পেও
মার্কিন বিদেশ মন্ত্রী

২৬/১১ হামলা দশ বছর পরও পাকিস্তান কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার প্রসঙ্গে



“যে সময় রামমন্দিরের শুনানি চলছিল তখন কংগ্রেসের এক রাজ্যসভার সাংসদ বিচারপতিদের রীতিমতো হুমকি দেন, যাতে ২০১৯-এর আগে যেন মামলার শুনানি না হয়। কারণ, উনিশে লোকসভা ভোট।”

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

রামমন্দির নিয়ে কংগ্রেসের রাজনীতি প্রসঙ্গে রাজস্থানে এক জনসভায় ভাষণে



“ভারতীয় নৌসেনার এখন বহুমুখী লড়াইয়ের শক্তি রয়েছে। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে যেকোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ভারতীয় নৌসেনাবাহিনী পুরোপুরি প্রস্তুত।”

অ্যাডমিরাল সুনীল লানবা
ভারতীয় নৌসেনা প্রধান

২৬/১১-র দশক পূর্তিতে সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষৎকারে



“পাকিস্তানের সামনে এখন দুটি পথ খোলা। এক, মানসিকতা বদল করে জঙ্গি নিধনে সহযোগিতা করে বাকি বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্কের সুবিধা ভোগ করা। দুই, আন্তর্জাতিক ভাবে একঘরে হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা।”

ডেনাল্ড ট্রাম্প
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

জঙ্গি দমনে বাধ্য করতে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে

কংগ্রেসের একাধিপত্যের যুগ শেষ

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

চলতি বছরের কয়েকমাস আগে কয়েকটা বিরোধী দল জোট বেঁধে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ-কে একটা বড়োসড়ো ধাক্কা দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু স্বস্তির বিষয় হলো, উভয় ক্ষেত্রেই তাদের হতাশ হতে হয়েছে। প্রকট হয়ে গেছে বিরোধীদের জোটবন্ধনের শোচনীয় রূপটা। সুতরাং তাঁদের পক্ষে আগামী লোকসভা নির্বাচন বা ছয় মাস পরের অনাস্থা প্রস্তাবের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া বোধহয় অন্য কোনও উপায় নেই।

একটা ক্ষেত্রে ছিল রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিষয়। বেশ কয়েকটা বিরোধী দল জোটবদ্ধ হয়ে কংগ্রেস দলের সাংসদ বি.কে. হরিপ্রসাদকে ভোটে দাঁড় করিয়ে পদটা দখল করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু গত ৮ আগস্ট ভোটাভুটিতে এনডিএ-র প্রার্থী সংযুক্ত জনতা দলের সাংসদ হরিপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ ১২৫-১০৫ ভোট- ফলের মাধ্যমে (অর্থাৎ ২০ ভোটে জয়ী হয়ে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

এটা লক্ষণীয় যে, বিরোধীরা ভোটের আগেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। এ.এ.পি. ভোটে অংশ নেয়নি। বিরোধীদের সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও ওয়াই. এস. আর. কংগ্রেসও ভোটদানে বিরত ছিল। কাশ্মীরের মেহবুবা মুফতি বিজেপির বিরুদ্ধে আগে মুখ খুলেও সেভাবে ভোট দেননি। প্রয়াত করুণানিধির কন্যা কানিমোঝি ও তাঁর এক দলীয় সঙ্গী ছিলেন গরজাজির। এমনকী, তৃণমূল কংগ্রেসের দুজন সাংসদও উপস্থিত হননি।

সেই তুলনায় বিজেপি তার সব শরিকদের সঙ্গে পেয়েছে। উপরন্তু বিজেডি, বি আর এস, এ আই এ ডি এম কে প্রভৃতি আঞ্চলিক দলেরও সমর্থন পেয়ে বিজয়-গৌরব অর্জন করেছে।

এটা লক্ষণীয় যে, বেশ কিছুদিন ধরে তৃণমূল, কংগ্রেস, বামদল, বি এস পি, এস পি ইত্যাদি দল বিজেপি-প্রভাবাধীন এন ডি এ-কে কোণঠাসা করার জন্য একটা 'ফেডারেল ফ্রন্ট' গঠনের প্রয়াসী হয়েছে। এদের অনেকের মধ্যে ঘনঘন বৈঠক ও ঐক্যের আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু ওই ধরনের ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারটা হয়ে গেছে আলেয়ার মতো।

বলা দরকার, আমাদের নির্বাচন কমিশনের হিসেবে নথিবদ্ধ রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এখন ২০০৪টি। তার মধ্যে অবশ্য ১৫০০টি দল সক্রিয়। এই ধরনের বহুদলীয় রাজনীতি দুনিয়ায় আর কোথাও আছে কিনা, জানি না। জাতপাত, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, আঞ্চলিকতা রাষ্ট্রতত্ত্ব, নেতৃত্ব দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত লোভ ইত্যাদির ভিত্তিতে অধিকাংশ দল গড়ে উঠেছে। তাদের সবাইকে দূরের কথা— কয়েকটাকে নিয়ে ফ্রন্ট গঠন করাও একটা অসম্ভব কাজ। বর্তমানে কয়েকটা দলকে নিয়ে এনডিএ এবং অন্য কয়েকটাকে নিয়ে ইউপিএ গঠিত হয়েছে। কিন্তু আরও কয়েক শো রাজনৈতিক দল রয়েছে তার বাইরে।

সুতরাং বিরোধী ঐক্যের ব্যাপারটা মরীচিকার মতো। বিশেষ করে, বহু নেতার মনে রয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কেউ চান প্রধানমন্ত্রী হতে, কারও নজর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গদির দিকে, কারও দরকার প্রভাব বিস্তার, কারও লক্ষ্য অর্থ ভাণ্ডার। এই হিসেব-নিকেশ কষতে গিয়েও জোট গঠন প্রক্রিয়া অবিরত বাধা পেয়েছে। এই সব কারণে ড. নর্মান ডি পামার মন্তব্য করেছেন, ভারতের দরকার একটা 'helthier party-system'--- (দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিকাল সিস্টেম, পৃ. ২১৪)। আর গ্রেল্‌ভিন্ অস্টিন মনে করেন, কংগ্রেসের একাধিপত্যের যুগ শেষ হওয়ার ফলে দেখা দিয়েছে বহু দলীয় সংকট, রেষারেষি ও অনিশ্চয়তা— (দ্য ইন্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ৩৩০)।

এই নড়বড়ে দল ব্যবস্থা নিয়ে বড়ো কিছু করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে বহুবার বহু দলীয় সরকার গড়ে উঠেছে সাময়িক সমঝোতার ফলে। কিন্তু স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য দরকার একক গরিষ্ঠতা আর নয়তো তত্ত্বগত সামঞ্জস্য। নিছক ক্ষমতা দখলের জন্য কৃত্রিম ঐক্য গঠিত হলে সেটা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। এই কারণে ড. বি সি রাউত লিখেছেন, 'Political praties in India should agree on the fundamental principles and procedures to be followed for the attainment of those prinieples'— (ডেমোক্র্যাটিক কন্‌স্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২০০)।

বলা বাহুল্য, বহু ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী দলগুলোর সাময়িক লোড ক্ষণস্থায়ী ঐক্য এনে দিয়েছে, তাতে অনৈক্য এসেছে বেশি করে। ড. হরিহর দাসের ভাষায়— 'The split in the parties is more due to personal rivalry for power than ideological differences'--- (ইন্ডিয়ান ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৩৩২)। চারটে দল নিয়ে ১৯৭৭ সালে 'জনতা দল' গড়ে উঠেছিল। ১৯৮৮ সালে সাতটা দলকে নিয়েও একটা ফ্রন্ট তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি শিবসেনা ও টিডিপি এনডিএ ত্যাগ করেছিল। কিন্তু তাতেও এদের সাফল্য আসেনি। এম এন সিক্রি মন্তব্য করেছেন, কারণ ওরা 'at logger heads with each other'— (দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ১৪৮)।

যাঁরা বিজেপিকে হঠানোর জন্য সম্প্রতি আদাজল খেয়ে ফেডারেল ফ্রন্টের কথা বলে চলেছেন তাঁরা এত কিছু বোঝেননি— তাঁদের লক্ষ্য শুধু মসনদ। কেউ বলেছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে রাজি (যেন কেউ তাঁকে সেধেছেন), কেউ দাবি করেছেন, এবার

বাঙালি প্রধানমন্ত্রীর দরকার (না, নাম করেননি)। এর জন্য কেউ আবার 'শিবভক্ত ব্রাহ্মণ সেজেছেন।

১৫০০টি রাজনৈতিক দল নিয়ে ঐক্য হবে? কয়েকশো দল বাদ যাবে সেটা থেকে? ওতে নেতৃত্ব দেবেন কে? এই ধরনের ঐক্য প্রয়াসের ফলাফল দেখা গেছে কয়েকমাস আগের অনাস্থা প্রস্তাব নিয়েই।

সম্প্রতি শিবসেনা ও পিডিপি এনডিএ ফ্রন্ট ত্যাগ করায় মহা-উৎসাহে বেশ কয়েকজন বিরোধী-নেতা এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে সরকারকে ভূপতিত করার কথা ভেবেছিলেন। উত্থাপন করা হয়েছিল অনাস্থা প্রস্তাব। এটা অবশ্যই করা যায়। কারণ আমাদের সংবিধানের ৭৪ (৩) নং অনুচ্ছেদে আছে— 'The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the peaple।' অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা লোকসভার কাছে দায়ী। অনাস্থা প্রস্তাবে বা নিন্দাসূচক প্রস্তাবে সরকার পরাজিত হলে তাকে পদত্যাগ করতে হয়। কাজেই লোকসভায় আটকে গেলেও সরকারের পতন ঘটে।

পূর্বোক্ত বিরোধী নেতারা লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব এনে ১৮ জুলাই তারিখে সরকারকে নতজানু করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল— সরকারের পতন ঘটবে। কংগ্রেস-নেত্রী সোনিয়া গান্ধী বলেই ফেলেছিলেন, তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে।

কিন্তু ফলাফলটা তাঁদের এই ক্ষেত্রেও হতাশ করেছে। ৫৪৫টা আসন বিশিষ্ট লোকসভায় বর্তমানে আছেন ৫৪৩ জন। সুতরাং সরকার ভাঙার জন্য দরকার ২৭২ জন সদস্যের ভোট। ভোটাভুটির আগের একটা হিসেবে দেখেছি— বিজেপির দখলে আছে ২৭৩টি আসন— শরিকদের নিয়ে ৩০৮টি। সুতরাং ফলাফল নিয়ে তার কোনও চিন্তাই ছিল না। তবে কোনও কোনও পত্রিকা সোৎসাহে জানিয়েছিল যে, বিজেপি-পক্ষ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। অবশ্য ফলাফলে দেখা গেল— সরকার-পক্ষ সেখানে পেয়েছে ৩২৫টি ভোট, বিপক্ষে পড়েছে ১২৩টি ভোট। শিবসেনা, টি আর এস, এএপি প্রভৃতি দলের সমর্থনও বিরোধীরা পাননি। বরং সরকার পক্ষের ভোট পড়েছে হিসেবের বাইরে থেকেও। ২০০৩ সালে বিজেপির অটলবিহারী বাজপেয়ী জিতেছিলেন ৩১২/১৮৬ ভোটে— এবার ব্যবধানটা আরও কিন্তু বেড়েছে। এবার এএপি, ওয়াই এস আর কংগ্রেস ইত্যাদি দল বিরোধী আসনে থাকলেও সরকার-পক্ষের বিরোধিতা করেনি। বরং বিজু-জনতা দল, এ আই এ ডি এম কে, টি আর এস-ও ভোট দিয়েছে এনডিএ-র পক্ষে। এমনকী এএপি নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন, বিরোধীদের সঙ্গে তাঁর দল কখনও থাকবে না। কারণ তাদের কাছে ইতিবাচক ভূমিকা নেই। বলা বাহুল্য, বেশ কিছু নেতা যখন মহা উৎসাহে বিজেপিকে হঠানোর জন্য একটা বড়োসড়ো ফ্রন্ট তৈরি করতে চাইছেন, তখন অনাস্থা ভোট এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানের নির্বাচন বিরোধীদের অনৈক্যকে বরং প্রকট করে দিয়েছে।

এবার বাকি রইল আগামী ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন। এতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আসন গ্রহণ করেন। সুতরাং বিজেপি-কে হঠাতে হলে বিরোধীদের রাজ্যে রাজ্যে বিপুল পরিমাণে ভোট বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, কিছু বড় দলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সমঝোতা, আন্তরিকতা ও দেশসেবার মহান ব্রত নিয়ে। সবচেয়ে বড় কথা— ১৯৮৪ সালে বিজেপি পেয়েছিল লোকসভার মাত্র দুটো আসন। এখন তার আসন ২৭৩ আর ২৯ টার মধ্যে ১৯ টা রাজ্য তার শাসনাধীন। এর পেছনে আছে কোন জাদু সেটা বুঝতেই হবে। আর কোনও পথ নেই। ▮



নোবেল কমিটির মূল্যায়নেও আন্তর্জাতিক সমীকরণ কাজ করে

প্রণব দত্তমজুমদার

২০১৮ সালের নোবেল শান্তিপুরস্কার ঘোষিত হয়েছে গত ৫ অক্টোবর। এবার নোবেল শান্তিপুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন দুজন— উত্তর ইরাকের ইয়েজিদি সমাজের মানবাধিকার ও সমাজকর্মী ২৫ বছরের নাদিয়া মুরাদ এবং ৬৩ বছর বয়স্ক মঙ্গলীয় মানবাধিকার ও সমাজকর্মী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডেনিশ মুকয়েজ। যুদ্ধের সময় বা বিভিন্ন নারীরা হয় সহজ শিকার। তারা পাশবিক যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। সেই বর্বরতার বিরুদ্ধে নির্ভীক এবং নিরলস সংগ্রাম করে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলেন এই দুজন।

নাদিয়া মুরাদ সিরিয়ার সীমান্ত লাগোয়া উত্তর ইরাকের 'কোজো' এলাকার ইয়েজিদি সম্প্রদায়ের মেয়ে। ১৯১৪ সালে আই এস আই এস জিহাদিরা ওই এলাকায় হানা দেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল অ-মুসলমানদের জোর করে ধর্মান্তর করে স্বঘোষিত খলিফা আবু বকর আল-বাগদাদির আওতায় ইসলামের রাজত্ব কায়েম করা। জিহাদিদের দাবি অনুযায়ী ধর্মীয় সংখ্যালঘু ইয়েজিদিরা ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় তাদের নির্বিচারে হত্যা করে জিহাদিরা। প্রায় ৬,৭০০ নারী ও শিশুকে আইসিস জিহাদিরা বন্দি করে নিয়ে যায়। শিশুদের জিহাদিদের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয় ভবিষ্যতের জিহাদি বানাবার জন্য। আর নারীদের যৌনদাসী হিসাবে জিহাদিদের মধ্যে বিক্রি করে দেওয়া হয় তাদের যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্য। এই হতভাগ্য মেয়েদের মধ্যে ছিলেন ২১ বছরের যুবতী নাদিয়া মুরাদ যাঁর সবক'টি ভাইকে জিহাদিরা হত্যা করেছে। দিনটা ছিল ২০১৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। বহু হাতবদল হতে থাকেন তিনি। ইসলামি জিহাদিদের দ্বারা হতে থাকেন লাগাতার ধর্ষিতা। কিন্তু ভাগ্যের জোরে একদিন জিহাদিদের হাত থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হন। তিনি জার্মানিতে আশ্রয় নেন। কিন্তু নরপশুদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যে কাজটি তিনি করলেন তা এক যৌনলাঞ্ছিতা নারীর পক্ষে চরম সাহসিকতার কাজ। তিনি তাঁর এবং অন্য নারীদের উপর জিহাদিদের দ্বারা সংগঠিত ধারাবাহিক যৌন লাঞ্ছনার কথা গোপন না রেখে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ লিখে ও বক্তৃতার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। খুলে দেন ধর্মের আড়ালে থাকা এইসব নরপশুদের মুখোশ। নাদিয়া লেখেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ— "The Last Girl : My story of Captivity and My Fight Against the Islamic State. বইটি নভেম্বর ২০১৭-তে Penguin Books থেকে ছাপা হয়। তিনি গঠন করেন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান--- 'নাদিয়া ইনিশিয়েটিভ' যার কাজ হলো ধর্মীয় বা জাতিগত বিদ্বেষের ফলে গণহত্যা, যুদ্ধ, নারী ও শিশু অপহরণ, ইত্যাদির ফলে নারী ও শিশুজেদের উপর যে পাশবিক ও নরক যন্ত্রণা নেমে আসে তা থেকে তাদের মুক্ত করা, তাদের সামাজিক ন্যায় দানের ব্যবস্থা করা, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এইসব কাজে তাঁর নির্ভীক নিরলস নিরন্তর প্রয়াস এই ক'বছরের মধ্যেই বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর এই কাজকে স্বীকৃতি ও উৎসাহপ্রদানের জন্য ২০১৮ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয় তাঁকে।



ডাঃ ডেনিস মুকয়েজ



নাদিয়া মুরাদ

নাদিয়া মুরাদের সঙ্গে একইসঙ্গে 'নোবেল শান্তি পুরস্কার' পান 'ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো'-র ডাক্তার ও সমাজকর্মী ডেনিশ মুকয়েজ। তিনি ১৯৫৫ সালের ১ মার্চ 'ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো'র বুকাভু-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিএইচডি প্রাপ্ত একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। 'প্রথম কঙ্গো যুদ্ধে'র রেশ কাটতে না কাটতেই ১৯৯৮ সালে শুরু হয়ে যায় 'দ্বিতীয় কঙ্গো যুদ্ধ' যাকে 'গ্রেট ওয়ার অব আফ্রিকা'ও বলা হয় এবং যা চলে ২০০৩ সাল পর্যন্ত। সেই থেকেই নানা সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠীর মধ্যে নানা স্বার্থজনিত কারণে অনবরত লড়াই হয়ে চলেছে। আর তার সহজ শিকার সেখানকার নারীরা। এইসব সশস্ত্র জঙ্গি দ্বারা অনবরত ধর্ষিতা হচ্ছেন বহু অসহায় নারী। এইসব ধর্ষিতা নারীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন ডাঃ ডেনিশ মুকয়েজ। তিনি প্রথমে তাবু খাটিয়ে এইসব যৌন নিপীড়িত নারীদের অপারেশান আরম্ভ করেন। হাজার হাজার ধর্ষিতা নারী আসতে থাকে সেখানে, বছরে যার সংখ্যা প্রায় ৩৫০০। তিনি বুকাভুতে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'পঞ্জি হসপিটাল'। দিনে প্রায় ১০টা করে অপারেশান করেন। দিনে প্রায় ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন। তিনি ওখানে এখন ডাঃ মিরাকেল নামে পরিচিত। ডাঃ মুকয়েজ এইসব যৌনলাঞ্ছিত নারীদের মানবাধিকার এবং সামাজিক অধিকারের জন্যও নিরন্তর লড়াই করে চলেছেন। তাঁর এই কাজের জন্য তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন। যেমন— Sakharov Prize, United Nations Prize in Human Rights, Seol Peace Prize, Le-

gion of Honour ইত্যাদি আরও অনেক পুরস্কার। অবশেষে পেলেন ২০১৮ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার।

নোবেল পুরস্কারের কথা উঠলে অবশ্যই এসে যায় ডিনামাইটের সুইডিশ আবিষ্কর্তা আলফ্রেড নোবেলের নাম। তিনি সুইডেনের স্টকহোমে ২১ অক্টোবর ১৮৩৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। মারা যান ১৮৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর ইটালিতে। তিনি ছিলেন একাধারে রসায়নবিদ, কারিগরি বিশেষজ্ঞ, বারুদ সামগ্রীর প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা ব্যবসায়ী। 'ডিনামাইট' নামক বিস্ফোরক আবিষ্কারের ফলে তিনি পৃথিবী বিখ্যাত হন। যদিও তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন নানারকম নির্মাণ কাজের সুবিধার জন্য। কিন্তু দেখা গেল পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে তাঁর আবিষ্কৃত ডিনামাইটের ব্যবহার বেড়ে গেল। লোকে তাঁকে 'মার্চেন্ট অব ডেথ' বলতে লাগল। ডিনামাইট আবিষ্কারের ফলে রয়্যালটি বাবাদ প্রচুর অর্থ উপার্জন হলেও তাঁর আবিষ্কার মানুষের ধ্বংসের কাজেও প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে দেখে তাঁর মনে আনন্দের বদলে অনুশোচনাই বেশি হতে লাগল। তাই মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর অর্থকে মহৎ কাজে দান করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ১৮৯৫ সালে উইল করে যান তাঁর দান করা অর্থের সুদ থেকে পৃথিবীর মানব সমাজের কল্যাণ, প্রগতি ও শান্তির জন্য যাঁরা অসাধারণ ও অভূতপূর্ব অবদান রাখবেন তাঁদের পুরস্কৃত করার জন্য। সেটাই 'নোবেল' পুরস্কার। ১৮৯৫ সালে নোবেল কমিটি তৈরি হয়। ঠিক হয় রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, সাহিত্য, শান্তি, শারীরবিজ্ঞান ও মেডিসিন এই ক্ষেত্রগুলিতে যারা পৃথিবীর মধ্যে অভূতপূর্ব ও অসাধারণ অবদান রাখবেন তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হবে। ১৯০১ সাল থেকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া আরম্ভ হয়। ২০১৭ সাল থেকে এর অর্থমূল্য ৯০ লক্ষ এসইকে, ভারতীয় মূল্যে ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। পরে ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতিতেও নোবেল প্রাইজ দেওয়া আরম্ভ হয়।

২০১৮ নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত প্রার্থী ছিলেন ৩৩১ জন। তার মধ্যে ২১৬ জন ব্যক্তি এবং ১১৫টি প্রতিষ্ঠান। ১৯০১ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত 'শান্তি'র জন্য নোবেলপুরস্কার দেওয়া হয়েছে ৯৯টি। অনেক সময় একই বছরে একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই পুরস্কার পেয়েছেন। সেই হিসাবে এ পর্যন্ত ১০৬ জন ব্যক্তি এবং ২৭টি প্রতিষ্ঠান 'শান্তি'র জন্য নোবেল পেয়েছেন। এই ১০৬ জন ব্যক্তির মধ্যে ১৭ জন মহিলা।

'শান্তি'র জন্য নোবেল প্রাপকদের মধ্যে যেসব মহিলার নাম আমাদের কাছে খুব পরিচিত তাঁদের মধ্যে আছেন মাদার টেরিজা (১৯৭৯)। মায়ানমারের নেত্রী আং-সান-সুকি নোবেল পান ১৯৯১ সালে। পাকিস্তানের স্কুলছাত্রী মালালা ইউসুফজাই ২০১৪ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে নোবেল পান। তিনই এ পর্যন্ত নোবেল প্রাপকদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

যেসব পুরুষ শান্তির জন্য নোবেল পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে যাদের নাম আমাদের খুব চেনা, তাঁদের মধ্যে আছেন আমাদের ভারতের মানবাধিকার কর্মী কৈলাস সত্যার্থী। তিনি শিশুদের অধিকারের জন্য লড়াই করে চলেছেন। তাঁর 'বচপন বাঁচাও আন্দোলন', 'গ্লোবাল মার্চ এগেইন্সট চাইল্ড লেবার' ইত্যাদি পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর আন্দোলনের ফলে শিশুশ্রম সম্পর্কিত আইনকানুনের অনেক পরিবর্তন করা হয়। তিনি ২০১৪ সালে 'নোবেল' পান। আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশের 'গ্রামীণ ব্যাঙ্কে'র প্রতিষ্ঠাতা অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মী অধ্যাপক ড. মহম্মদ ইউনুস এক নুতন ধরনের মাইক্রোফাইনান্স ব্যবস্থার প্রবর্তন করে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ গরিব মানুষকে আর্থিক স্বয়ম্ভরতার পথ দেখিয়েছেন এবং বিশ্বের কাছে মাইক্রোব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সফল ব্যবহারিক মডেল তুলে ধরেছেন। এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। আমেরিকার মহান ব্যক্তি, যিনি মানবতার জন্য, সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করে গেছেন সেই মারটিন লুথার কিং (জুনিয়র) 'শান্তি'তে নোবেল পান ১৯৬৪ সালে। চীন কর্তৃক নির্বাসিত তিব্বতীয় ধর্মগুরু দলাই লামা (১৪তম), যিনি আমাদের ভারতের হিমাচলপ্রদেশের 'ধরমশালা'তে সসম্মানে বসবাস করছেন, তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পান ১৯৮৯ সালে। দক্ষিণ আফ্রিকার মহান নেতা, যিনি গান্ধীজীর অহিংসা সত্যাগ্রহ নীতির অনুসারী ছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার 'anti-apartheid movement' জনক, দক্ষিণ আফ্রিকার গণতান্ত্রিক সরকারের প্রথম ব্ল্যাক প্রেডিসেন্ট (১৯৯৪- ১৯৯৯), সেই নেলসন মেন্ডেলা শান্তিতে নোবেল পান ১৯৯৩ সালে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগেই এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। ২০০৯ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে নোবেল দেওয়া হয়।

নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রসঙ্গ উঠলে আর একজনের নাম ভারতীয়দের মনে আসবেই। তা হলো গান্ধীজীর নাম। নোবেল পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয় ১৯০১ সাল থেকে, গান্ধীজী মারা যান ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি। গান্ধীজী তাঁর শান্তি ও অহিংসা নীতির জন্য তাঁর জীবদ্দশাতেই পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাহলে গান্ধীজী কেন নোবেল পেলেন না? প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে একাধিকবার গান্ধীজীর নাম মনোনীত হয়েছিল। যেমন ১৯৩৭, ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালে গান্ধীজীর নাম নোবেল কমিটির কাছে পেশ হয়েছিল; কিন্তু নোবেল কমিটির বিচারে গান্ধীজী উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তখনকার নোবেল কমিটির অ্যাডভাইসার প্রফেসর Jacob Worm Muller-এর মতে গান্ধীজী অবশ্যই ছিলেন— 'a good, noble and ascetic person' কিন্তু রাজনীতিতে ঢোকার পর গান্ধীজী হয়ে উঠেন— 'a freedom fighter and a dictator, an idealist and a nationalist' অর্থাৎ তিনি আন্তর্জাতিক ছিলেন না, ছিলেন নাশান্যালিস্ট। প্রফেসর জেকব লক্ষ্য করেন গান্ধীজীর প্রচুর সমালোচক রয়েছেন, যাঁরা বলছেন গান্ধীজীর কাজে আন্তর্জাতিকতা নেই, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর লড়াই ছিল একান্ত ভাবেই ভারতীয়দের স্বার্থে, সেখানে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে কালোদের পক্ষে তিনি লড়াই করেননি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'জুলু বিদ্রোহের' (১৯০৬) সময় 'কালা আদমি' জুলুদের পক্ষ না নিয়ে 'সাদা আদমি' শাসক ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়েছিলেন গান্ধীজী এবং ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে প্রশংসনীয় কাজের জন্য তাঁদের কাছ থেকে পদক ও উপাধি লাভ করেছিলেন তিনি। যাই হোক, তখনকার নোবেল কমিটি গান্ধীজীর নাম বাতিল করে। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরেও মরণোত্তর নোবেলের জন্য তাঁর নাম নোবেল কমিটির কাছে পেশ করা হয়েছিল। নোবেল কমিটি নানারকম টেকনিক্যাল অসুবিধার কথা তুলে ধরে তা বাতিল করে দেয়। যাই হোক, নোবেল কমিটির মূল্যায়নের মধ্যে যে নানারকম আন্তর্জাতিক সমীকরণ কাজ করে না সেটা হলফ করে বলা যায় না। ▮

দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য ও গণতন্ত্রের বধ্যভূমি পশ্চিমবঙ্গ

কে. এন. মণ্ডল

নরেন্দ্র মোদী সরকারের যথেচ্ছ সংবিধান লঙ্ঘন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, হিন্দুত্ববাদীদের প্রশ্রয় দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার কফিনে শেষ পেরেকটি পর্যন্ত ঠুকে দিয়েছেন— এ প্রবচন নিত্যই শোনা যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীর মুখে। বক্তব্যের সমর্থনে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করছেন— নোটবন্দি, জিএসটি চালু করা, সারদা-নারদা এবং রোজভ্যলির দুর্নীতিতে সিবিআই লেলিয়ে দিয়ে তৃণমূলের মূল উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র, অসমে এনআরসি চালু করে বাঙ্গালি বিতাড়ন (পড়ুন অনুপ্রবেশকারী মুসলমান) এবং বিতর্কিত নাগরিক বিল পেশ। এছাড়াও রয়েছে বিজেপির প্ররোচনায় গোরক্ষকদের বাড়বাড়ন্ত এবং গুজরাটে বাংলার শ্রমিক নিপীড়ন তথা এক মুসলমান (বাঙ্গালি) যুবককে হত্যা ইত্যাদি।

এবারে দেখা যাক, বহুচর্চিত ওই সমস্ত অভিযোগের সারবত্তা আছে কিনা, না শুধুই ফাঁকা আওয়াজ যা জোসেফ গোয়েবল্‌স-এর লাইনে মিথ্যার ঝাঁপি। একথা ঠিক যে, নোটবন্দিতে সাধারণের কৃচ্ছসাধনের সমানুপাতিক সফলতা লব্ধ হয়নি। তাই বলে, ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়া সমান্তরাল কালোটাকার বাজারকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে দেশপ্রেমী উন্নয়নমুখী কোনও সরকার কুম্ভকর্ণের অবস্থান নিতে পারে কি? এমনকী, অর্থনীতিবিদ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহও বলেছেন— তিনিও এক পর্যায়ে নোটবন্দির কথা ভেবেছিলেন। তিনি যা বলেননি, তা হচ্ছে এ ব্যাপারে রাজনৈতিক ঝুঁকি নেওয়ার সাহস পাননি। একথা ঠিক, অধিকাংশ কালোটাকা ব্যাকিং চ্যানেলে ফিরে এসেছে, তবে ওই টাকার ব্যবহার এবং বিনিয়োগ ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ কালোটাকাই এখন সাদা হয়েছে এবং সরকার এর ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনা করতে পারে। কালো টাকার কারবারিরা পরিচিতদের সামান্য সুবিধার বিনিময়ে লাখ-লাখ জিরো ব্যালেন্স একাউন্টেও কালো টাকা জমা করিয়েছে। এসব সরকারের নজরে থাকলেও, আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার মতো পরিকাঠামো আয়কর বিভাগের নেই। কালো টাকার উপর আঘাত পড়ায় জমি-বাড়ির দাম নিম্নগামী হয়েছে। সম্ভবত এই বাজারে আর কোটি কোটি টাকায় নেতা-নেত্রীদের ছবি বিকবে না। আর জিএসটি চালু হয়েছে ভারতের সংসদে পাশ হওয়া আইনে— ভারতের প্রতিটি অঙ্গ রাজ্যের বিধানসভায় অনুমোদন লাভের পর। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। উল্লেখ্য, জিএসটি চালুর পরে সারা দেশে দ্রব্যমূল্য একই আইনে নির্ধারিত হচ্ছে শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই দেশের রাজস্ব আদায় অনেক বেড়েছে। তার ফলে রাজ্যগুলিরও আয় বেড়েছে অনেক যা রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করা যায়। শুধু কী তাই, Vote Catcher ক্লাবগুলিকে অনুদান দেওয়া যায়— এমনকী সংবিধানের তোয়াক্কা না করে পূজা কমিটিকে অনুদান দিয়ে এবং পরিশেষে কোটি কোটি সরকারি টাকা নয়ছয় করে দুর্গা-কার্নিভাল করে কু-নজির স্থাপন করা যায়। এভাবে জনগণের করের টাকা অপচয় করার সুযোগও জিএসটি এনে দিয়েছে। সমালোচকরা যা চেপে যাচ্ছেন তা হচ্ছে, জিএসটি ভারতের আর্থিক সংস্কারে একটি মাইল ফলক হিসাবে সমস্ত বিশ্বে বন্দিত।

তৃণমূলনেত্রী-উল্লেখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংসের বহু চর্চিত আর দুটি বিষয় হচ্ছে, সারদা ও নারদা দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআই লেলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। রোষের মূল কারণ, তৃণমূলের এমএলএ/এমপি সহ তাবড়-তাবড় নেতারা লাগাতার জেলের ঘানি টেনে, এখন অনেকেই জামিনে মুক্ত। এর তদন্তে যতই ঢিলেমি হোক— আদালতের নির্দেশে চলা এই তদন্ত বন্ধ করার ক্ষমতা তৃণমূল নেত্রীর নেই। সারদায় লগ্নিকৃত লক্ষ লক্ষ আমানতকারী প্রতারিত হয়েছেন— বেশ কয়েকজন আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। তৃণমূলের অনেক নেতা জড়িত থাকায় বিষয়টির যাতে সিবিআই তদন্ত না হয় তা রুখতে রাজ্য সরকার জনগণের করের টাকা খরচ করে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত 'মামলা' করে হেরেছে। আর নারদায় ঘুষ কেলেঙ্কারিতে তৃণমূলের কয়েকজন নেতা-মন্ত্রীকে পকেটে টাকা ঢোকাতে টেলিভিশনে সবাই দেখেছেন। এঘটনাকে সাজানো, দুষ্টলোকের ষড়যন্ত্র, বিজেপি অফিসে তৈরি মিথ্যা ভিডিয়ো বলে চালানো তৃণমূল নেত্রীর সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ফরেনসিক পরীক্ষার ফলে। হাতে-পকেটে কালো টাকা নেওয়া সাদা-পোশাকের নেতারা এখন জল চিবিয়ে বলছেন ওই টাকা দলের জন্য ডোনেশান। কংগ্রেস নেতা প্রকৃত ভদ্রলোক আব্দুল মান্নানের করা মামলায় হাইকোর্ট/সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবং পর্যবেক্ষণে সিবিআই তদন্তে এই দুর্নীতির মামলায় মোদীজীর হাত পাঠকবর্গ অন্তর্দৃষ্টিতেও কি অনুমান করতে পারছেন? তাহলে নরেন্দ্র মোদী সংবিধান বিরোধী প্রতিহিংসাপরায়ণ এ সমস্ত বুলি ঝোপে টেকে? বরং নিন্দুকরা বলেন তৃণমূল নেত্রীর ঘনিষ্ঠ (সুযোগ পেলে প্রধানমন্ত্রী করতেও একপা) এল.কে. আদবানী লোকসভার নীতি কমিটির চেয়ারম্যান হওয়া সত্ত্বেও গত তিন বছরে ঘুষ নেওয়া তৃণমূল এম.পি.-দের বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত করেননি--- তার অন্তরালে কি মোদীজীর হাত আছে? স্মরণ থাকতে পারে, অনুরূপ String Operation-এ ঘুষ নিতে গিয়ে ভিডিয়ো দেখার পরে লোকসভার নীতি কমিটি ইউপিএ জমানায় বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণকে লোকসভা থেকে শুধু বহিষ্কারই নয়, জেল হাজতেও পাঠান। তাহলে, বামপন্থীদের অভিযোগ 'বাইরে কুস্তি, ভিতরে দোস্তি' বিজেপি-তৃণমূলের এ সমীকরণের ভিত্তি আছে?

অনুরূপভাবে, ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে অসমে

বিদেশি অনুপ্রবেশকারী সনাক্তকরণের কাজ শুরু হয়েছে এনআরসি-এর মাধ্যমে। আর যে আইনের বলে এনআরসি-তে ভিত্তি বছর ধরা হয়েছে সেই আইনটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর রাজত্বে পাশ হয়েছে ভূগু ফুকন-প্রফুল্ল মহান্তদের সঙ্গে অসম চুক্তির ফলে। এতে বিজেপি বা নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকা কোথায়? কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতা থাকায় রাজধর্ম তো তাদের পালন করতেই হবে। অসমে সনাক্তকৃত বিদেশিদের বিষয়ে সরকার কী ব্যবস্থা নেবে বা এন আর সি-তে কত মানুষের নাম বাদ পড়লো তা নির্ধারিত হওয়ার আগে বাইরের কোনও উস্কানি আপাতশান্ত অসমকে অগ্নিগর্ভ যাতে না করে তার দায়িত্ব প্রত্যেকটি সচেতন নাগরিকের। এ প্রসঙ্গেই এসে যায় নাগরিকত্ব বিলের কথা। এই বিলটি বৈষম্যমূলক (তথাকথিত) হলেও বাস্তব ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। হাজার বছরের গোলামির পরে বহু ত্যাগের বিনিময়ে ভারতবাসী স্বাধীন হলো ভারতমাতার দেহ ত্রিখণ্ডিত করে। ক্ষমতালোভী ছাড়া আর কাউকেই এ আজাদি খুশি করতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ এবং পূর্ব বাংলায় সংগঠিত হলো ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ এবং লুটপাট। কোটি কোটি মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে আশ্রয় নিল ভারতে। ভারত সরকার পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানায় আটকে পড়া হিন্দু-শিখ-বৌদ্ধদের আশ্বস্ত করছে— ভারতের দ্বার খোলা থাকবে। অথচ তৎকালীন সরকার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পরামর্শ মতো করেনি জনবিনিময় বা কোনও দীর্ঘমেয়াদি নাগরিক আইন। সেই কাজটিই মোদী সরকার এখন করার প্রয়াস নিয়েছে। একমাত্র ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতিতে তুখোড় রাজনীতিকরা ছাড়া সবাই এই বিলের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। এর ফলে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভারতে বসবাসের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে রাজনীতির কারবারিরা গোরক্ষকদের তাণ্ডবের জন্যও দায়ী করছেন নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপিকে। অথচ আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যের আওতাভুক্ত। দুর্নীতির তদন্তেই বাধা দেওয়া রাজ্য সরকার তাদের রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ মেনে নেবে তো? সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গোহত্যা নিষিদ্ধ হলেই এই উৎপাতের সমাধান হতে পারে। পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই অবগত আছেন— ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ— আবার কোনও কোনও রাজ্যে গোহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণ দুটিই নিষিদ্ধ আছে। বহু যুগ ধরেই গোমাতা রক্ষায় সর্বভারতীয় আইন প্রবর্তনের দাবি উঠেছে। এমনকী মহাত্মা গান্ধী, আচার্য বিনবা ভাবে এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো ব্যক্তিরাও এর জন্য জীবনভর সওয়াল করেছেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি— বহু মুসলমান দেশেও গোহত্যা নিষিদ্ধ রয়েছে। আর যদি সারা দেশে এই আইন প্রণীত হয়। তাহলে আখলাদের নিয়ে তোষণের রাজনীতি করা যায় না— তাই আইনের পথে কেউ যাবে না। তাহলে নরেন্দ্র মোদীকে দায়ী করা কেন?

বিরোধীরা যতই সংবিধান ধর্ষিত হচ্ছে বলে আঙুল তুলছেন— কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না, সংবিধানের কোন ধারা কবে কোথায় লঙ্ঘিত হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে একটি রাজ্য সরকারকেও বরখাস্ত করেছেন— তার উদাহরণ নেই। শুধু কী তাই, লোকসভায় বিজেপির নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও, বিতর্কিত অথচ বিজেপির রাজনৈতিক এজেন্ডাভুক্ত ৩৭০ ধারা বাতিলের দাবি বা সকলের জন্য সাধারণ দেওয়ানি আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেনি। এতে বিজেপিতে অসন্তোষ থাকলেও, প্রধানমন্ত্রী রাজধর্ম পালনের জন্য তথ্য বিতর্ক এড়াতে কোনও পদক্ষেপ নেননি। তাই বলে, সরকার প্রশাসনিক অগ্রাধিকার ভুলে নিষ্কর্মা হয়ে থাকতে পারে না। দেশ রক্ষা এবং সংবিধান রক্ষা মোদী সরকারের অগ্রাধিকার। আদালত বা নির্বাচন কমিশন সহ সব সাংবিধানিক সংস্থাগুলির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সরকার।

অন্যদিকে, তৃণমূল সরকার আসার পরে পশ্চিমবঙ্গে একটি নির্বাচনও নিরপেক্ষ হয়নি— বিশেষ করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কতটা নিরপেক্ষ হয়েছে তার মাপকাঠি হচ্ছে নির্বাচনে নিহতের সংখ্যা হাফ-সেঞ্চুরি পেরুল কিনা তা দ্বারা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের মনোনয়ন পেশে বাধা থেকে শুরু করে ভোট গণনাকেন্দ্রে হার্মাদদের লম্ফ-ঝম্ফ রাজ্যবাসীর স্মৃতিতে এখনো উজ্জ্বল। এমনকী স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও বিরোধীদের বাধা দেওয়া হচ্ছে সর্বত্র— বিশেষ করে প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে। সভা করার অনুমতি না দেওয়া থেকে পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে তাদের বিক্ষোভ-জমায়েতে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও বিজেপি নেতা বা অন্য দলের বিরোধী কর্মীরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। এ সমস্ত কারণেই আজ বিরোধী রাজনীতি এত তপ্ত এবং ভবিষ্যতে রাজনীতি আরও হিংসাশ্রয়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

একথা ঠিক, তৃণমূলের গত ৮ বছরের শাসনকালে বাম আমলের থেকে উন্নয়ন বেশি হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যুত এবং জল ও সড়ক ব্যবস্থার। উন্নয়ন তো ফাঁকা বুলিতে সম্ভব হয় না— এজন্য দরকার টাকা। মোদী সরকার ক্ষমতা আসার পরে চতুর্দশ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করে রাজ্যগুলির রাজস্ব প্রাপ্তি ৩২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪২ শতাংশ করেছে এবং খরচের স্বাধীনতাও রাজ্যগুলিকে দিয়েছে। এর ফলে যেমন হাজার হাজার কোটি টাকা বাড়তি পেয়েছে রাজ্য, তেমনি আবার কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ায় ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা বরাদ্দ হচ্ছে অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা, বেকারি (প্রমাণ লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিন রাজ্য যাচ্ছে কাজের খোঁজে) স্বজন পোষণ, খাদ্য বণ্টনে বৈষম্য, বহু পরিবারের রেশন বন্ধ কার্ড না পাওয়ার জন্য। ফলে, তৃণমূল স্তরে Have এবং Have not জন্ম নিচ্ছে। এরই মধ্যে শবরদের মৃত্যুতে সরিষার মধ্যে ভূতের অস্তিত্ব প্রতিফলিত হচ্ছে। নারীদের উপর সংঘটিত অপরাধে পশ্চিমবঙ্গ— বিশেষ করে ধর্ষণ এবং নারী পাচারে শীর্ষে চলে এসেছে। কন্যাশ্রীতে জনসাধারণের করের টাকা বিলালেই শিক্ষার অগ্রগতি হয় না। খবর আছে,— ওই টাকায় কেউ কেউ স্মার্টফোন কিনছে। শিক্ষায় ডোল-ব্যবস্থা চালুর চেয়েও মানোন্নয়ন বেশি প্রয়োজন। দুর্নীতি আর স্বৈরাচার নিয়ে মোদী সরকারের দিকে আঙুল না তুলে তৃণমূল সরকার আত্মশুদ্ধির কাজ করুক।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

অশান্ত পঞ্জাব
খালিস্তানি মুখোশের আড়ালে ইসলামি জিহাদ

চন্দ্রভানু ঘোষাল

ভারত-পাক সীমান্তে জঙ্গি হামলা নতুন কোনও ঘটনা নয়। বস্তুত এতকাল দুই দেশের সীমান্তবর্তী রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরই ছিল পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের বিচরণভূমি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অনমনীয় মনোভাব এবং সেনাবাহিনীর সক্রিয়তায় জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি উপদ্রব ক্রমশ কমছে। বিপদটা আঁচ করতে পেরে জঙ্গি নেতারাও তাদের কাজের পদ্ধতি এবং ক্ষেত্র বদলাবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই মুহূর্তে সারাদেশে ছড়ানো সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য পঞ্জাব। কিছুদিন আগে অমৃতসরে বড়োসড়ো জঙ্গি হামলা হয়ে গেছে। স্থানীয় পুলিশ তো বটেই, পঞ্জাবের মানুষও জানেন এই হামলা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অনেকদিন ধরে চলছে এর প্রস্তুতি। গত কয়েক মাসের মধ্যে অধিকৃত কাশ্মীরের আজাদির দাবিকে সমর্থন করা, কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে জনসমক্ষে হেয় করা এবং খালিস্তানের দাবি আবার নতুন করে উসকে দেওয়ার জন্য পঞ্জাবে বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে। শুধু তাই নয়, পঞ্জাবের বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে সন্দেহজনক বহিরাগতের ভিড় বাড়ছে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে পঞ্জাবের পরিবেশ বিষিয়ে দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করা।

সুতরাং বলা যেতে পারে পঞ্জাবের পরিস্থিতি বিপজ্জনক। ধর্মীয় অধিকারের দাবি এবং রাজনৈতিক প্রতিবাদের নামে বহু নেতা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। এবং তাদের এই নেতিবাচক মনোভাবের ফলে জঙ্গি আন্দোলন দানা বাঁধছে পঞ্জাবে। পঞ্জাবিরা স্বভাবত উগ্র এবং আবেগ প্রবণ। ছদ্মবেশী জঙ্গি নেতারা সাধারণ পঞ্জাবিদের আবেগকে ব্যবহার করে ফয়দা লুটতে চাইছেন।

এ ব্যাপারে গণভোট : ২০২০-র কথা বলা যেতে পারে। কিছুদিন আগে এই গণভোট সংঘটিত হয়েছে লন্ডনে। এবং ভোটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খালিস্তান গঠনের দাবি। বিদেশের ভারত বিরোধী সংগঠনগুলি অনেকদিন ধরে এই ধরনের একটা আন্দোলনের জন্য অপেক্ষা করছিল। এই গণভোট তাদের সামনে দুটো সুযোগ এনে দিয়েছে। এক, তাদের দাবি নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার এবং দুই, পঞ্জাবকে অশান্ত করে তোলার। ইউরোপের জঙ্গি সংগঠনগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নানারকম কর্মসূচি নিয়েছে। গণভোট : ২০২০-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য



ভারতীয় আইন ব্যবস্থার অবব্যাখ্যা করা। এটা দেখানো যে ভারতের সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে সংখ্যালঘুরা নিরাপদ নয়। সৌভাগ্যের বিষয় বিদেশে বসবাসকারী শিখ এবং অন্য ধর্মাবলম্বী ভারতীয়রা এখনও ততটা প্রভাবিত হননি। কিন্তু স্বাধীন খালিস্তানের দাবিতে লন্ডনের এই আন্দোলনের ফলাফল অদূর ভবিষ্যতে সাংঘাতিক হতে পারে।

গণভোট : ২০২০ যদি আগুনের শিখা হয় তাহলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ইন্ধনের উৎস রয়েছে বারগারি মোর্চার মতো সংগঠনগুলির হাতে। শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহিবের অবমাননার প্রতিবাদে শুরু হয়েছিল বারবারি মোর্চার আন্দোলন। কিন্তু এখন তারা লক্ষ্যচ্যুত। বিদেশি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির অর্থে ফুলেফেঁপে উঠেছে তাদের কোষাগার। এবং এর ফলে নষ্ট হয়েছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা। মোর্চার মঞ্চে প্রায়শই ভারতবিরোধী নেতাদের দেখা যাচ্ছে। অমৃতসরের অকালি দলের শাখা সংগঠন হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল বারগারি মোর্চা। ১৯৮০ সালে তাদের দাবি ছিল, খালিস্তান গঠন নিয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং খালিস্তানপন্থী নেতাদের যে সমঝোতা হয়, তার নিষ্পত্তি। সে সময় শিরোমণি অকালি দলও এই দাবিকে সমর্থন করেছিল।

নিঃসন্দেহে এই ধরনের তাৎক্ষণিক লাভ ঘরে তোলার রাজনীতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ঠিক যেমনটি হয়েছে পঞ্জাবে। জনজাতি এবং মুসলমান ভোটের জন্য কংগ্রেসের তোষণনীতি এখানকার পরিস্থিতিকে বেশ বিপজ্জনক করে তুলেছে। বারগারি মোর্চার দাবি ছিল, শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহিবের অবমাননাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। কিন্তু এখন তাদের নতুন দাবি, মোর্চার যেসব নেতা কারাগারে রয়েছেন তাদেরও ছেড়ে দিতে হবে এবং যারা পঞ্জাবের বাইরের জেলে রয়েছেন তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে পঞ্জাবের জেলে।

মোর্চা নেতাদের সামলাতে পঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারের এখন নাজেহাল অবস্থা। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে জাস্টিস রঞ্জিত সিংহ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর। অভিযোগ, রিপোর্টটি সরকারি ভাবে প্রকাশিত হবার আগেই ফাঁস হয়ে যায়। যাই হোক, এখন দেখা যাক রিপোর্টে কী

আছে। রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে অচিরেই পঞ্জাবে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সংঘটিত হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর কংগ্রেস শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহিব অবমাননার তদন্ত করার জন্য জাস্টিস রঞ্জিত সিংহের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করেছিল। বস্তুত অবমাননা-ইস্যুই ছিল সেবার কংগ্রেসের জেতার অন্যতম প্রধান কারণ। নির্বাচনের আগে অবমাননা নিয়ে দলের প্রচার এবং ক্ষমতায় ফিরলে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি স্পর্শ করেছিল ধর্মভীরু শিখ নর-নারীর হৃদয়। এখন প্রশ্ন হলো, এত গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপন একটি রিপোর্ট কীভাবে ফাঁস হয়ে গেল? বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। কংগ্রেসের মতো সন্দেহজনক ভূমিকা আম আদমি পার্টির নেতা সুখপাল সিংহ খাইরারও। তিনি বারগারি মোর্চার সমর্থনে আলাদা করে বারগারি ইনসাফ মোর্চা গঠন করেছেন। তার থেকেও বড়ো কথা জাস্টিস রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে তার পারিবারিক সম্পর্ক। একাধিক নিউজ চ্যানেলের অন্তর্তদন্তে জানা গেছে, রিপোর্ট ফাঁস হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে জাস্টিস রঞ্জিত সিংহ এবং সুখপাল সিংহ খাইরার যোগসাজশ। এদের উদ্দেশ্য স্বাধীন খালিস্তানের দাবিকে আর একবার উসকে দেওয়া।

নিউজ এজেন্সির দেওয়া তথ্যে আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে। সেটি বারগারি মোর্চার কোষাগারে জমা হওয়া বিদেশি অর্থ সংক্রান্ত। কোথা থেকে আসছে এত অর্থ? সূত্রের খবর, সারা বিশ্বের একাধিক জঙ্গি সংগঠন সাহায্য করছে মোর্চাকে। সারা পঞ্জাবে আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার জন্য পরিকাঠামোগত সাহায্য করে ইন্ধন জোগাচ্ছে কংগ্রেসও। ফলও মিলছে হাতেনাতে। সম্প্রতি নিউইয়র্কে দিল্লি শিখ গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির প্রধান মনজিত সিংহ জি.কে. খালিস্তানপন্থীদের হাতে আক্রান্ত হন। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য মিডিয়ায় খালিস্তানপন্থী আন্দোলনের প্রচার। আক্রমণকারীরা জানত শ্রীগুরুনানক দেবজীর ৫৫০তম প্রকাশপর্বের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মনজিত সিংহ জি.কে. নিউইয়র্কে যাবেন। সুতরাং পরিকল্পনা করেই কাজে নেমেছিল তারা। দেখাতে চেয়েছিল খালিস্তান বিরোধী কেউ ভারতের বাইরে গেলে তারা তাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। এরকম করতে পারলে ভারতীয় মিডিয়ায় যে হৈচৈ পড়ে যাবে সেটাও তারা জানত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মনজিত সিংহ জি.কে. শিরোমণি অকালি দলের নেতা। নিউইয়র্কের আগে ক্যালিফোর্নিয়াতেও তার ওপর হামলা হয়েছিল। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, ক্যালিফোর্নিয়ার ইউবা শহরে ৩০-৩৫ জন খালিস্তানপন্থী তার ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা গণভোট : ২০২০-এর সমর্থনে স্লোগান দিচ্ছিল। মনজিত সিংহ জি.কে.-এর একজন সহকারী গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পুলিশ পরে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

এর পরের ঘটনা খোদ ভারতে। রোপার জেলের কাছে আক্রান্ত হন অল ইন্ডিয়া শিবসেনা (হিন্দু) দলের নেতা নিশান্ত শর্মা। হত্যা করার উদ্দেশে ভোজালি দিয়ে তাকে কোপানো হয়। ভাগ্যের জোরে তিনি বেঁচে যান। শিখ উগ্রপন্থা বিরোধী অবস্থানের জন্য সারা ভারতে নিশান্ত শর্মার পরিচিতি আছে। সেই জন্যেই এই কাপুরুষোচিত আক্রমণ। পুলিশের অনুমান, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা দেবেন্দর গোঁসাইয়ের হত্যাকাণ্ডে জড়িতরা নিশান্ত শর্মার ওপর হামলা করে থাকতে পারে।

পঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দেবার আর একটি কারণ বহুজন ক্রান্তি মোর্চা। মোর্চার নেতারা নানারকম উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। তাদের বক্তব্য, 'ব্রাহ্মণরা ভারতীয় নয়। তারা আর্য। ভারতের বাইরে থেকে এসেছে।' মোর্চার নেতারা নিজেদের 'মূলনিবাসী ভারতীয়' বলে জাহির করছে। কিছুদিন আগে বারগারি মোর্চা আর বহুজন ক্রান্তি মোর্চার যৌথ সম্মেলন হয়ে গেছে। তাদের দাবি, ব্রাহ্মণদের ভারতের বাইরে বের করে দিতে হবে। ভারত হবে 'মূলনিবাসী' ভারতীয়দের অর্থাৎ শিখ মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের দেশ। বলা বাহুল্য, বারগারি মোর্চার নেতারা এই দাবি সমর্থন করেছেন। ক্রান্তি মোর্চার নেতারা পঞ্জাবের গ্রামে- শহরে চলে যাচ্ছেন এবং ভেদাভেদের কথা বলে মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। শুধু তাই নয়, মোর্চার নেতারা এখন গ্রামেগঞ্জে গিয়ে বোঝাচ্ছেন হিন্দি বলয়ের পাঁচ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তারা যেন বিজেপিকে ভোট না দেন। এই মগজধোলাই যে ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত চলবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

তবে পঞ্জাবের মানুষ এখন বেশি আতঙ্কিত খলিস্তানি আন্দোলনের আড়ালে ইসলামি জিহাদের প্রস্তুতিতে। সম্প্রতি পঞ্জাব এবং জম্মু-কাশ্মীর— এই দুই রাজ্যের পুলিশ জলন্ধরের কাছে শাপুরে সিটি ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজির হস্টেলে যৌথ অভিযান চালায়। অবৈধ এ কে-৪৭ রাইফেল রাখার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয় তিনজন ছাত্রকে। হস্টেলে রাইফেল রাখার মূল পাণ্ডা জাহিদ গুলজার শ্রীনগরের কাছে রাজপুরায় থাকে। তার সঙ্গী মহম্মদ ইদ্রিশ শাহ ওরফে নাদিম এবং ইউসুফ রফিক ভাটের বাড়ি পুলওয়ামায়। পঞ্জাবের ডিজি সুরেশ অরোরা জানিয়েছেন ধৃতরা সকলেই জঙ্গি সংগঠন আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দের সঙ্গে যুক্ত। আরও যে চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে সেটি হলো, ইউসুফ রফিক ভাট সম্পর্কে জাকির মুসার ভাইপো। সেনাবাহিনীর মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে এই জাকির মুসার নাম একেবারে প্রথম দিকে রয়েছে। যাই হোক, ওই তিন ছাত্রের উদ্দেশ্য ছিল অমৃতসরের শ্রী দরবার সাহিবে বিস্ফোরণ ঘটানো। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই তিন ছাত্র ধরা পড়ার পর কোনও এক রহস্যজনক কারণে হস্টেলের অন্য কাশ্মীরি ছাত্ররাও উধাও হয়ে গেছে। এর থেকে পুলিশের অনুমান, পঞ্জাবে ইসলামি জঙ্গিরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, খালিস্তানি জঙ্গিদের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ রয়েছে। অনুমানের স্বপক্ষে প্রমাণও দিয়েছে পুলিশ। মিডিয়ার অন্তঃতদন্তে সমর্থিত হয়েছে সেই প্রমাণ। জানা গেছে, মুজফ্ফরাবাদের আল কায়দা প্রশিক্ষণ শিবিরে খালিস্তানপন্থী বব্বরখালসার জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ পর্ব পরিচালনার দায়িত্বে ছিল খোদ জাকির মুসা। তারই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাশ্মীরি ছাত্রদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সমগ্র পঞ্জাবে। এমনিতেই বহু কাশ্মীরি ছাত্র পঞ্জাবে পড়াশোনা করতে আসে। তাতে সুবিধেই হয়েছে মুসাদের। পুলিশের সন্দেহ, সম্প্রতি দীনানগর পাঠানকোট এবং মকসুদানে যেসব বিস্ফোরণ ঘটেছে তাতে হাত থাকতে পারে কাশ্মীরি ছাত্রদের।

সব মিলিয়ে বেশ সংকটজনক অবস্থা। সমগ্র পঞ্জাব জুড়ে জইশ এবং লস্করের জঙ্গি ক্রিয়াকলাপের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে কাশ্মীরি ছাত্ররা। এরা স্বাধীন খলিস্তানের সমর্থক। সব জেনেও কংগ্রেস নীরব দর্শক। কারণ ভোটের বালাই বড়ো বালাই। তাতে দেশ উচ্ছন্নে যায় যাক।■

নব কলেবরে স্বস্তিকা

আমি সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা' পত্রিকার দীর্ঘকালের পাঠক। গত প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমি নিয়মিত মনযোগ সহকারে এই সাপ্তাহিক পাঠ করে আসছি।

এই পত্রিকার সুন্দর মৌলিকের হাস্যরসাত্মক, শ্লেষাত্মক রচনা, সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্তের রাজনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক রচনা, গুঢ়পুরুষের প্রতিবেদন, অতিথি কলম বেশ আকর্ষণীয়। নিয়মিত বিভাগের মধ্যে মহিলাদের জন্য 'অঙ্গনা'র বরাদ্দ মাত্র একপাতা। একপাতার মধ্যে মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করা কঠিন হলেও শ্রীমতী সুতপা বসাক ভড় একাই সেই প্রচেষ্টা সুন্দরভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। শিশুদের জন্য আছে 'নবাঙ্কুর'। এক্ষেত্রেও স্বল্প পরিসরে ছোটোদের প্রতি সুবিচার করা যায় না।

এছাড়া এই সাপ্তাহিকের এক শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী বর্তমান। ড. নির্মলেন্দু বিকাশ, নন্দলাল ভট্টাচার্য, ড. জিষ্ণু বসু, পুলকনারায়ণ ধর, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. সুদীপ ঘোষ, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, প্রমুখের বিভিন্ন বিষয়ের রচনা পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে পাঠকরাও এই সব রচনার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হন না। বিজয় আঢ্যের রচনায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধটি অত্যন্ত সজীব ও মর্মগ্রাহী মনে হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের উপরও তাঁর রচনা বেশ উপভোগ্য।

স্বস্তিকার লেখকরা পৌরাণিক, ধর্মমূলক, রাজনৈতিক, চিকিৎসা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের উপর গুরুগম্ভীর রচনা লিখে থাকেন। কিন্তু এগুলি ছাড়াও একটু হাঁফ ছেড়ে বিনোদন মূলক রচনার জন্য সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করতে হয়। তিনি অতীত যুগের নামকরা চিত্রতারকাদের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে তাঁদের অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদের স্মৃতিমেদুরতায় ভরিয়ে তোলেন। এবারের পূজাসংখ্যায় তাঁর রচনা 'একপর্দা পেক্ষাগৃহের মায়া' এক কথায় অসাধারণ।

সম্প্রতি গত কয়েকমাস যাবৎ পত্রিকার আঙ্গিকে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন সর্বদাই স্বাগত। কিন্তু পরিবর্তন অবশ্যই পূর্বাপেক্ষা উন্নত ও প্রগতিশীল হওয়া প্রয়োজন। যেমন আগে পত্রিকার শেষ পাতায় ছিল 'শব্দরূপ'। এই ধরনের শব্দছক প্রতিটি পত্রপত্রিকায় স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু স্বস্তিকার শব্দছক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ছকটির শব্দগুলির অধিকাংশের পুরাণ বা রামায়ণ, মহাভারত থেকে সংগৃহীত। পরিবর্তে এসেছে 'রাশিফল' যা অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কার গ্রস্ত। সত্যই কি এক বা দুলাইনে একটি বিশেষ রাশির বিচার মানুষের কোনও উপকারে আসে? তাও আবার জন্মছক ব্যতিরেক গোচরফল বিচার দ্বারা। পরবর্তী পরিবর্তন প্রতি সংখ্যায় একটি ছোটো গল্পের সংযোজন। ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্য জগতে তার বিশিষ্টতার জন্য বিশেষ স্থান দখল করেছে। স্বস্তিকায় যে সব গল্প ছাপা হচ্ছে তা অধিকাংশই আদৌ ছোটোগল্পের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। বস্তুত এগুলি গল্পই হয়ে উঠতে পারেনি। পাঠযোগ্যও নয়। তাই এগুলি স্বস্তিকার অমূল্য তিন চার পাতার অপচয় বলেই মনে হয়। প্রতি সংখ্যায় না ছেপে বাছাই করা ভালো গল্প কোনও কোনও সংখ্যায় ছাপা যেতে পারে। এই পত্রিকায় যেসব চিঠিপত্র ছাপা হয় তাতে পত্রিকা সম্বন্ধে পাঠকদের কোনও মতামত থাকে না। তাই আমি আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামত জানালাম। এর উদ্দেশ্য কিন্তু সমালোচনা করা নয়। পাঠকদের সুচিন্তিত মতামত পত্রিকাকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে। পাঠকদের কেউ কেউ এই ধরনের আলোচনা করলে আমার প্রয়াস সার্থক হবে। আমি পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

—স্বপন দাশগুপ্ত,
১৭/৫/১ কাশীনাথ চ্যাটার্জী লেন,
শিবপুর হাওড়া-২।

রামমন্দির চাই

১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট বাবর অযোধ্যায় একটি মন্দির ধ্বংস করে তার মালমশলা দিয়ে ধ্বংসস্তূপের উপরেই নির্মাণ



করে একটি সৌধ। স্থানীয় হিন্দুদের দাবি, ধ্বংস করা মন্দিরটি রামমন্দির এবং ওখানেই জন্ম নিয়েছিলেন ভগবান রামচন্দ্র। কিন্তু মুসলমানরা হিন্দুদের দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে দাবি করে যে নির্মিত সৌধটি 'বাবরি মসজিদ'। অতপর কেটে গিয়েছে ৪৬৪ বছর। ইতিমধ্যে ঘটেছে মন্দির-মসজিদ দাবি নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অসংখ্যবার দাঙ্গা। রক্তপাত হয়েছে প্রচুর। প্রাণ গিয়েছে অগণিত হিন্দুর। তবুও হিন্দুরা মন্দিরের দাবি ছাড়েনি। দাবি ছাড়েনি মুসলমানরাও। মামলা গড়িয়েছে আদালতেও। কিন্তু কোনও সমাধান সূত্র মেলেনি। ততদিনে সরযূ নদী দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু জল। ভেঙেছে হিন্দুদের ধৈর্যের বাঁধ।

১৯৯০ সালে তদানীন্তন সরকার সংসদে এক 'অর্ডিন্যান্স' বা অধ্যাদেশ জারি করে বিতর্কিত জমিটি অধিগ্রহণ করে। ওদিকে রামমন্দির নির্মাণের প্রস্তুতিও চলতে থাকে জোরকদমে। অতপর ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের হাজার হাজার রামভক্ত ধৈর্য হারিয়ে বাবরি ধাঁচাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। তখনকার উত্তরপ্রদেশের রামবিরোধী তথা বাবরপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহ যাদব (মোল্লা মুলায়ম!)-এর হিংস্র পুলিশের গুলিতে সেদিন হতাহত হয়েছে বহু রামভক্ত। গ্রেপ্তারের সংখ্যাও অসংখ্য। পরবর্তীকালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট এক রায়ে বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমির দুই-তৃতীয়াংশ মন্দির ও এক-তৃতীয়াংশ মসজিদের জন্য বরাদ্দ করে। কিন্তু ওই রায়ে কোনও পক্ষই খুশি হতে বা মেনে নিতে না পেরে মামলাটিকে নিয়ে যায় সুপ্রিম কোর্টে। তবে মামলাটি ছিল দীর্ঘদিন মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। গত ২৯ অক্টোবর ওই মামলার শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু শুনানির দিন পিছিয়ে গিয়েছে জানুয়ারি মাসে। আর এই ঘটনায় রামভক্তরা

আশাহত। তারা আর কালক্ষেপ করতে নারাজ। তাই তারা চাইছে, সত্বর রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হোক। এ ব্যাপারে তারা মোদী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে— সংসদে অডিন্যান্স জারি করে রামমন্দির নির্মাণের পথকে সুগম করা হোক। মোদী সরকার সম্ভবত রামভক্ত কোটি কোটি হিন্দুর দাবিকে উপেক্ষা করতে পারবে না। কারণ ইতিপূর্বে সংসদে অর্ডিন্যান্স এনে তিন তালাককে এই সরকারই কয়েকমাস আগে বেআইনি করেছে আইন করে। রামমন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রেও সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। মোদী সরকার অগত্যা সেই পথে হাঁটবে বলে হিন্দুদের বিশ্বাস।

ইতিপূর্বে প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে বিতর্কিত জমিতে একদা রামমন্দির ছিল এবং সেই মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপরে নির্মিত হয়েছে বাবরি সৌধ, যাকে 'মসজিদ' বলে দাবি করা হচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে মুসলমান আক্রমণকারীদের দেশে দেশে সাম্রাজ্য তথা আধিপত্য বিস্তারের নমুনা। বাবর ছিল বিদেশি আক্রমণকারী। তাই অযোধ্যার রামমন্দির ধ্বংস এবং তার উপরে বাবরি ধাঁচা নির্মাণ ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। বহু দেশে ওই বিধর্মী আক্রমণকারীরা ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সেইসব দেশের অসংখ্য মঠ, মন্দির, গির্জা এবং উপাসনালয় ধ্বংস করে সেই জমিতেই নির্মাণ করেছে মসজিদ। ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে বলপূর্বক সেইসব দেশের ভিনধর্মী মানুষদের। ভারতবর্ষেও ঘটিয়েছে তারা সেই সব কুকীর্তি। এদেশের লক্ষ লক্ষ মঠ, মন্দির ধূলিসাৎ করে সেখানে নির্মিত হয়েছে মসজিদ। এসব তো ইতিহাস। অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই তথাকথিত বাবরি মসজিদে মুসলমানদের কোনও অধিকার নেই। ওই বিতর্কিত জমি তাদের ছেড়ে দিতেই হবে। ইতিপূর্বে কোনও রামবিরোধী সরকার যে কাজ করেনি সেই কাজটি করতে হবে হিন্দুত্ববাদী মোদী-সরকারকে। তবে আইন মেনে, সংসদে অর্ডিন্যান্স এনে। আর সে ক্ষমতা মোদী সরকারের আছে। যাতে 'সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে'। আর এটাই হচ্ছে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছা। কারণ রামলালা আর কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না অস্থায়ী ছাউনির মধ্যে। তাই রামের কৃপায় সুবর্ণ সুযোগ সমাগত। তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। কথায় বলে— Time and Tide wait for none।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গানুসন্ধান

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ৪৯-৫৩) 'দুর্গা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। যদিও 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামে গ্রন্থ প্রকাশের সময় তিনি লেখাটিকে বাদ দিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, কোনও বৈদিক সংহিতায় দেবী দুর্গার বিশেষ কোনও উল্লেখ নেই। তবে ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টমাষ্টকের 'রাত্রি পরিশিষ্টে একটি দুর্গা-স্তব রয়েছে। তার ১২ সংখ্যক শ্লোকে রয়েছে—

''তামগ্নিবর্ণান্তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।।''

ড. জন মিয়ো কৃত এই শ্লোকটির ইংরেজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র--- অগ্নিবর্ণা তপের দ্বারা জ্বালাবিশিষ্টা, বৈরোচনী, কর্ম্মফলে জুষ্টা, দুর্গাদেবীর শরণাগত হই, হে সুবেগবতী! বঙ্কিম মত প্রকাশ করেছেন, নাম 'দুর্গা' হলেও এই দুর্গা পূজিতা দুর্গা ছিলেন না, ছিলেন কেবলমাত্র রাত্রিস্তোত্র হয়ে। এখানে 'দুর্গা' রাত্রির অন্যতর নামমাত্র হয়েই ব্যক্ত হয়েছে। বঙ্কিম বাজসনেয় যজুর্বেদ সংহিতায় একস্থানে 'অম্বিকা'-র উল্লেখ খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু এই অম্বিকা সেখানে শিবের ভগিনী। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে কোথাও দেবী দুর্গার উল্লেখ নেই; নেই উপনিষদের কোনও স্থানেও। তবে কেনোপনিষদের একস্থানে 'উমা হৈমবতী' নাম পাওয়া যাচ্ছে আর মুণ্ডকোপনিষদের একস্থানে পাওয়া যাচ্ছে 'কালী করালী'-র নাম। এখানে কালী বা করালী কেউই দেবী হিসেবে নন, রয়েছেন অগ্নির সাতটি জিভের অন্যতমরূপে। অগ্নির সাতটি জিভ হলো : কালী, করালী, মনোজবা, সিলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফূলিঙ্গিনী এবং বিশ্বরূপী। বঙ্কিম জানিয়েছেন, কেনোপনিষদে উমা হৈমবতীকে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা বলা যেতে পারে। উল্লেখ করেছেন, মহাভারতের ভীষ্মপর্বে অর্জুনের দুর্গাস্তবেও দুর্গা 'ব্রহ্মবিদ্যা' রূপে পরিচিতা। বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গাগায়ত্রী আছে—

''কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গী প্রচোদয়াৎ।'' বঙ্কিম আর একটি সূত্র দিয়েছেন কৈবল্যোপনিষদ থেকে; বলেছেন সেখানে 'উমা সহায়ম্' বলে উল্লেখ আছে মহাদেবের। সমস্ত আলোচনার পরে বঙ্কিম প্রশ্ন তুলেছেন, বঙ্গদেশের আরাধ্য দেবতা দুর্গা প্রকৃতপক্ষে কে? তিনি কি রাত্রি, তিনি কি মহাদেবের ভগিনী? তিনি ব্রহ্মবিদ্যা না অগ্নিজিহ্বা?

বঙ্কিম প্রশ্ন তুলেছেন, এই দেবী দুর্গা বা কালী কোথা থেকে এসেছেন? যা বেদে নেই, তা হিন্দুধর্মের অন্তর্গত কিনা, সন্দেহ তা নিয়েও। বলেছেন, সমস্ত হিন্দুর এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত।

—ড. কল্যাণ চক্রবর্তী,
কল্যাণী, নদীয়া।

নরেন্দ্র মোদীকেই ২০১৯-এ প্রয়োজন

স্বস্তিকা পত্রিকায় ৫ নভেম্বর বিশিষ্ট চিকিৎসক ও অধ্যাপক ডাঃ রবীন্দ্রনাথ দাসের 'নরেন্দ্র মোদীই ভারতের শেষ আশা-ভরসা' প্রবন্ধটি সময়োচিত ও যুক্তিযুক্ত। দেশবাসী তাঁর সমৃদ্ধ লেখাটি থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছেন ২০১৯-এ কেন পুনরায় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়া দরকার। পাঠককে এরকম একটি মননশীল লেখা উপহার দেওয়ার জন্য ডাক্তারবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামীতে এরকম লেখার অপেক্ষায় রইলাম।

—শঙ্কর সাহা,
ঋষি বঙ্কিমনগর, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

বন্যাত্রাণে মাতৃশক্তিও পিছিয়ে নেই

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

মহিলা ক্ষমতানের পথে চলতে চলতে মাতৃশক্তির কত নতুন রূপই না আমাদের সামনে এসেছে। আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠেছি। তবুও আমরা কী কখনও ভাবতে পেরেছি যে আমাদের দেশেরই কিছু প্রান্তে বন্যাত্রাণে রক্ষাকর্ত্রীর ভূমিকায় সক্রিয়ভাবে বিরাজমান কেবলমাত্র মহিলারা! একটু আশ্চর্য হবার মতোই কথা। কিন্তু হ্যাঁ এটি বাস্তব ঘটনা।

সাতটি নদী দিয়ে ঘেরা বিহারের খগড়িয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ভয়ঙ্কর বন্যা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তবে বন্যা হলে ত্রাণকার্য থেকে শুরু করে পশু এবং মানুষের প্রাণ বাঁচানোর মতো গুরুদায়িত্ব অবলীলায় পালন করার থাকেন ৩০০ জন গ্রাম্য মহিলা। ওই এলাকায় কোসী, বাগমতী এবং মালতীর মতো নদীগুলি যখন প্রচণ্ড বেগে গ্রামগুলিকে



কোসী, বাগমতী ও মালতী নদীর জলে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক বিহারের বন্যা দুর্গতদের উদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন এরকম প্রায় ৩০০ মহিলা।

ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন ওই ভীষণ বন্যায় আটকে পড়া মানুষদের রক্ষা করে সাহস এবং সহযোগিতার এক নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করে চলেছেন ওই মহিলারা।

এঁরা সবাই দক্ষ সাঁতারু এবং ত্রাণকাজের ব্যাপারেও অভিজ্ঞ। বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে ওঠা নদী সাঁতার দিয়ে পার হয়ে বিপদগ্রস্ত গ্রামবাসীদের বাঁচানো এবং সুরক্ষিত জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেন। এই মহিলারা ছোটো ডিঙি বা নৌকার মাধ্যমে বন্যার জলে ভেসে যাওয়া গ্রামগুলিতে খাদ্যসামগ্রী এমনকী পশুখাদ্যও পৌঁছে দেন নিজেদের স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায়। বন্যা সুরক্ষায় তৎপর এই মহিলারা বন্যার খবর পেলেই ছুটে যান সেখানে এবং ত্রাণকার্য শুরু করে দেন। বেশিরভাগ স্বয়ংসেবী সংস্থার ত্রাণগোষ্ঠী এঁদের সাহায্য নিয়েই ওইসব এলাকার প্রত্যন্ত বন্যাপ্রভাবিত অঞ্চলে পৌঁছে যান।

বিপদ থেকে বাঁচানো এবং ত্রাণকার্যে আত্মনিবেদিত এই দলটিতে ওই জেলার ২০টি গ্রামের ৩০০ জন মহিলা কার্যরত আছেন। এঁদের ত্রাণ এবং বন্যা সহায়তামূলক কাজে প্রায় ১০ বছরের অভিজ্ঞতা আছে। কিসান বিকাশ ট্রাস্ট নামক একটি স্বয়ংসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে ২০০৬ থেকে ২০১২ ছ' বছরের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই দলটি তৈরি করা হয়েছে। তারপর থেকেই ওই এলাকায় বন্যাত্রাণ এবং সেবাকাজে অগ্রণী মহিলাদের এই দলটি। কিসান বিকাশ ট্রাস্টের সংগঠক কৃষ্ণমোহন সিংহের মতে এই মহিলারা খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে বন্যাত্রাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন। বন্যার সময় বন্যাপ্রভাবিত এলাকাগুলিতে এঁরা খুবই নির্ভরযোগ্যরূপে নিজেদের প্রতিপন্ন করেছেন। মাঝেমধ্যে লাইফ জ্যাকেট পরেও এঁরা সাঁতার অভ্যাস করে থাকেন। তবে এঁদের জন্য যদি আরও উন্নততর সামগ্রী পাওয়া যায়, তবে বন্যা-ত্রাণকার্য আরও বেশি, আরও সহজ হয়ে উঠবে এবং সেক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা আরও বেশি প্রভাবশালী হবে।

বিহারের মালতী নদী বেশ গভীর। এই নদীতীরের একটি গ্রাম মালতী ভিট্টা। গ্রামটি বন্যার প্রকোপে প্রায়শই পরে। এখানকার পূর্ব ওয়ার্ড সদস্যা ডোমনী দেবী জানান, এই গ্রামের বেশিরভাগ পুরুষই কর্মসূত্রে গ্রামের বাইরে থাকেন। ঘর-সংসার এবং বাচ্চাদের দেখাওনার দায়িত্ব মূলত মহিলাদের ওপর ন্যস্ত থাকে। নিজেদের রক্ষার দায়িত্ব নিতে নিতে এঁরা সমগ্র গ্রামের সুরক্ষার ভার নিয়ে নিয়েছেন। এই মালতী ভিট্টা গ্রামের মোহন দেবী, গুলাবদেবী, ঘৌলীদেবী, অনিতাদেবী, মনিতাদেবী, রিঙ্কু দেবী, শান্তিদেবী, সাবিত্রীদেবী সমেত মোট ২০ জন মহিলা কুশল সাঁতারু এবং বন্যাত্রাণে নির্ভরযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।

বন্যা যে কী ভয়ঙ্কর রূপ নেয়, আমরা অনেকেই সে সম্পর্কে ধারণা করে উঠতে পারি না। সমুদ্রে স্নান করতে নেমে একটু বেশি জলে গেলেই সাবধান হয়ে যাই, ঠাকুর বিসর্জনের সময় নদীর জলে জোয়ার এলে নদী কর্তৃপক্ষ বারবার সতর্ক করে দেয়ে; সে জায়গায় উপছে ওঠা নদী এবং জলে ভেসে যাওয়া গ্রামের পর গ্রামে এঁরা কোন মনের জোরে পৌঁছে মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের রক্ষা করেন, তা ঈশ্বরই জানেন! পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শারীরিক ক্ষমতা একটু হলেও কম, কিন্তু রক্ষাকর্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণা এই গ্রাম্য মহিলারা সব প্রতিকূলতাকে জয় করে বন্যাগ্রস্ত মানুষের কাছে হয়ে উঠেছেন পরম নির্ভরযোগ্য আপনজন। ▮

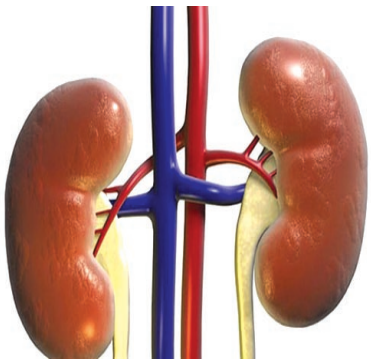

কিডনি ভালো রাখতে চিনি খাওয়া কমান

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মানবদেহের রেচনতন্ত্র গঠিত একজোড়া বৃক্ক বা কিডনি, একজোড়া গবিনী, একটি মূত্রাশয় এবং একটি মূত্রথলি নিয়ে। বিপাক ক্রিয়ার ফলে দেহকোষে নানা দূষিত রেচন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই সকল রেচন পদার্থসমূহ যে ধারাবাহিকতার সাহায্যে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়, চিকিৎসাবিজ্ঞানে তা এক্সক্রিশন নামে পরিচিত। মূত্রত্যাগ মানবদেহের প্রধান রেচন কৌশল। উল্লেখ্য যে, ফুসফুস জলীয় বাষ্প এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগের মাধ্যমে এবং চামড়া ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে দেহ থেকে রেচন পদার্থ ত্যাগে যথার্থ সহায়তা করে। ফুসফুস এবং চামড়াকে বলা হয় সহায়কারী রেচন অঙ্গ। তবে কিডনি অর্থাৎ বৃক্কই হলো মানবদেহের প্রধান রেচন যন্ত্র। শতকরা পঁচাত্তর ভাগ রেচন বস্তু এই অঙ্গের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। আজ তাই আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদরা বৃক্ককে দেহের অন্তর্দেশীয় সাম্যাবস্থা বজায় রাখার মুখ্য যন্ত্র রূপে বর্ণনা করেছেন।

শিমের বিচির মতো কালচে বাদামি বর্ণের বৃক্ক ওজনে প্রায় একশো পঁচিশ থেকে একশো সত্তর গ্রাম হয়। বৃক্ক দুটি মানবদেহের উদর গহ্বরের কটি অঞ্চলে মেরুদণ্ডের উভয় পাশে পেরিটোনিয়ামের নীচে, পৃষ্ঠ প্রাচীর সংলগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। সাধারণ প্রস্থচ্ছেদ থেকে বৃক্ক বা কিডনির আণুবীক্ষণিক গঠনের ধারণা পাওয়ার চেষ্টা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ব্যোওম্যান প্রথম বৃক্কের আণুবীক্ষণিক গঠনের বর্ণনা দেন। বৃক্কের লম্বচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করলে তার মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় কুণ্ডলীকৃত নালিকা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে নেফ্রন বলে। আসলে নেফ্রন হলো বৃক্কের গঠনমূলক এবং কার্যমূলক একক। বৃক্কের নেফ্রনের মধ্যেই মূত্র উৎপন্ন হয়। এক একটি বৃক্কে প্রায় দশ লক্ষ নেফ্রন থাকে। নেফ্রনের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ সেন্টিমিটার। দুটি বৃক্কের সব নেফ্রন (২০ লক্ষ) পর পর যোগ করলে প্রায় চল্লিশ মাইল লম্বা হবে। লম্বচ্ছেদে বৃক্কের প্রতিটি অর্ধাংশ দুটি স্তর দেখা যায়। বাইরের দিকে অবস্থিত পাণ্ডুর বর্ণের 'কর্টেক্স' এবং ভিতরের দিকে অবস্থিত কালচে বর্ণের মেডালা। মোট নেফ্রনের শতকরা পঁচাশি ভাগ কর্টেক্সের পরিধির দিকে অবস্থিত। অবশ্য এগুলি সুপারফিসিয়াল নেফ্রন নামেও পরিচিত। আর বাদ বাকি শতকরা পনেরো ভাগ কর্টেক্সের ভিতরের দিকে অবস্থিত। অবশ্য সুপার নেফ্রনগুলি জাক্সামেডালারি নেফ্রন হতে আকারে ক্ষুদ্র হয়। মূলত বৃক্ক বা কিডনি এমন একটি যন্ত্র যার মাধ্যমে বিকারজাত দূষিত পদার্থগুলিকে বিশেষ করে নাইট্রোজেন ঘটিত এবং সালফার গঠিত পদার্থগুলিকে মূত্রের সাহায্যে বাইরে বের করে দেয়। তবে বৃক্ক কিন্তু কলা বা তরল যোগ কলা রক্তের অভিস্রাবনিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণেও তড়িৎ বিশ্লেষণের সাম্যাবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করতেও উল্লেখযোগ্য সহায়তা করে। তাছাড়া কিডনি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবেও কাজ করে এবং রেচন ও ইরিথ্রোপায়েটিক ফ্যাক্টর ক্ষরণ করে। দেহের অম্লক্ষারের সাম্যাবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য, রক্তে শর্করার পরিমাণ ১৮০ মিলিগ্রাম (একশো মিমি রক্তে) কিংবা এর উর্ধ্বে হলে বৃক্ক রক্তের অতিরিক্ত শর্করাকে মূত্রের সঙ্গে নির্গত করে রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক হতে সাহায্য করে। অবশ্য বৃক্কের অন্তর্গত নেফ্রনে রক্তের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি পুনঃশোষণ ঘটিয়ে রক্তের উপাদানের সমতা বজায় রাখে, রেচন তন্ত্রের অন্তর্গত বৃক্ক দেহের ভিটামিন-ডি কিংবা করে। আজকাল কিডনির প্রদাহ জটিল আকার ধারণ করেছে। কিডনির প্রদাহ নিঃশব্দে তার নিজের মহিমা প্রকাশ করেছে রোগীর দেহে।

সতর্কতা : কিডনি ভালো রাখতে চিনি খাওয়া কমাতে হবে। কারণ ক্যালোরি জোগানো ছাড়া চিনির আর কোনো গুণ নেই। অতিরিক্ত খেলে বরং শরীর ইউরিক অ্যাসিড তৈরির হার বেড়ে যেতে পারে। পরে এই ইউরিক অ্যাসিডের হাত ধরে কিডনি ও হৃদরোগের সমস্যা হতে পারে। সফট ড্রিঙ্ক যারা খান তাদের প্রোটিন-ইউরিয়া নামে ইউরিনের সঙ্গে প্রোটিন বেরোনোর সমস্যা হতে পারে। কিডনির খারাপ হওয়ার বেশ বড়ো মাপের লক্ষণ এটি। জলও যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাওয়া যায় তা প্রাণঘাতী হতে পারে। কিডনি খারাপ হতে পারে কৃত্রিম রংয়ের রাঙানো খাবার, জাঙ্কফুড, হাইপ্রোটিন ডায়েট নিয়মিত খেলে। অতিরিক্ত রেডমিট খেলে কিডনি ফেলিওরের চান্স তিন গুণ বেড়ে যায়। প্রচুর নুন খেলেও সমস্যা আছে। আবার সস, কৌটার খাবার ইত্যাদিতে নুন বেশি থাকে বলে নিয়মিত খেলে প্রেশার বাড়তে পারে, আর প্রেশার বাড়া মানে কিডনির ওপর অতিরিক্ত চাপ।

কিডনি বাঁচানোর খাবার : খাবারের মোট ক্যালরির ৬০-৬৫ শতাংশ যেন কার্বোহাইড্রেট থেকে আসে। দিনে একবাটি ভাত, গোটা চারেক রুটি, চিড়ে, মুড়ি, খই এবং দু-তিন রকম শাকসবজি, ফল খান। সকালে ছোলা বা মুগ ভেজানো অল্প খেতে পারেন। বিকেলেও অল্প বাদাম চলতে পারে। খেয়াল রাখবেন সসেজ, বেক, রাজমা, সয়াবিন, সবই কিন্তু প্রোটিন। একটা খেলে আরেকটা কমিয়ে ব্যালান্স রাখবেন।

কিডনি ভালো রাখতে গেলে একেবারে শুয়ে বসে থাকা যেমন চলবে না। তেমনি অতিরিক্ত জিম করলেও বিপদ। দিনে ৩০-৪০ মিনিট কার্ডিও এক্সারসাইজ যেমন রিক্স ওয়ার্কিং, সাঁতার, সাইক্লিং ইত্যাদি যথেষ্ট সঙ্গে ২০ মিনিট যোগা। প্যারাসিটামল সাধারণ ভাবে ভালো। তবে নিয়মিত খাবেন না। ❙



রাফাল যুদ্ধবিমান এবং বিরোধীদের মিথ্যে অভিযোগ

শৌভিক রাতুল বসু

এটি বাস্তব যে নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে কেন্দ্রে কোনও বড়ো দুর্নীতির ঘটনা ঘটেনি। যে 'দুর্নীতি' শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল নেহরু জমানা থেকে হালের ইউপিএ-২ পর্যন্ত, কংগ্রেসের প্রতিটি রাজত্বকালে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই দিশাহারা কংগ্রেস 'রাফাল' যুদ্ধবিমান ক্রয়ে দুর্নীতি হয়েছে বলে মিথ্যে প্রচার করে সংবাদ শিরোনামে আসতে চাইছে। রাফাল চুক্তি যে স্বচ্ছতার সঙ্গেই করা হয়েছে তা বলবার আগে প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক রাফাল চুক্তিটির ইতিহাসের দিকে।

প্রতিরক্ষার জন্য ভারতের Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) কেনা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়াতে ২০০৭ সাল থেকেই এর প্রচেষ্টা শুরু হয়, দরপত্র ডাকা হয়। শেষে ৩১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে ইউপিএ-২ সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয় যে ফ্রান্সের Dassault Rafale কোম্পানি Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) দরপত্রটি জিতেছে। এই দরপত্র অনুযায়ী—

(১) Dassault Rafale ১৮টি যুদ্ধবিমান সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায় ভারতকে দেবে যদিও তাতে কোনও ক্ষেপণাস্ত্র, অস্ত্র থাকবে না। সেনাদের প্রশিক্ষণ আর ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য সুবিধা পেতে হলে আলাদা খরচ করতে হবে।

(২) বাকি ১০৮টি বিমান Dassault Rafale এদেশে তৈরি করবে সরকারি সংস্থা HAL-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। কারিগরি সহায়তা দেবে ফ্রান্সের সংস্থাটিই।

সমস্যাটি বাঁধল এখান থেকেই। ভারত সরকার HAL-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি হওয়া ১০৮টি রাফাল জেটের বাকি ১৮টি জেটের মতো সমপরিমাণ কোয়ালিটির গ্যারান্টি চাইলেও ফ্রান্সের সংস্থাটি তা দিতে অস্বীকার করে জানায় যে তারা HAL-এর কারিগরি দক্ষতার ওপর ভরসা রাখতে পারছে না। এই টালবাহানায় ইতিমধ্যেই বিমানের দাম বেড়েছে। ২০০৭ সালে ১২৬টি বিমানের জন্য যে $১০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ধরা হয়েছিল তা ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে বেড়ে হয় $৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অদ্ভুতভাবে ভারতের সুরক্ষার সঙ্গে আপোশ করে এই অতীব প্রয়োজনীয় চুক্তিটি ইউপিএ-২ সরকার রদ করে দেয় ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

২০১৪-এর মে মাসে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসীন হয়েই দেশের সুরক্ষার দিকে সর্বপ্রথম নজর দিলেন। রাফাল বিমান কেনা নিয়ে টালবাহানা চলছে বলে তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পার্রিকর Sukhoi Su-30MKI বিমানের প্রস্তাব করলেও তৎকালীন Air Chief Marshal অরূপ রাহা তা খারিজ করে দেন।

এরপরই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার ভারতীয় বিমানবাহিনীর পরামর্শ আর প্রয়োজনার্থে রাফালের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে। ২০১৫ সালের এপ্রিলে মোদীর ফ্রান্স সফরে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয় এবং ওই বছরেরই জুলাই মাসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজ্যসভায় ইউপিএ-২ জমানার ১২৬টি রাফাল বিমান কেনার দরপত্র বাতিল ঘোষণা করার পাশাপাশি নতুন করে ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানান। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত এবং ফরাসি সরকারের মধ্যে ৭.৮৭ বিলিয়ন ইউরোতে ৩৬টি রাফায়েল কেনার চুক্তি সই হয়। এই চুক্তির মধ্যে অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য সুবিধা India-Specific Enhancement (required by the IAF) এবং প্রশিক্ষণ খরচ ধরে নেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেসের অভিযোগ :

১। কেন ১২৬টির পরিবর্তে ৩৬টি যুদ্ধবিমান কেনা হচ্ছে?

২। সরকার ৩ গুণ বেশি দাম দিচ্ছে।

৩। কারিগরি প্রযুক্তি আদান-প্রদান হচ্ছে না, ফলে ভারতের প্রযুক্তিগত লাভ হচ্ছে না।

৪। HAL-এর বদলে Reliance Defence-কে কেন সহযোগী করা হলো?

৫। Defence Procurement Procedure (DPP) বা প্রতিরক্ষা সংগ্রহ পদ্ধতি ভাঙা হয়েছে।

এই অভিযোগগুলো যে কতখানি অসাড়, সেটাই এবার দেখানোর চেষ্টা করব।

(১) কেন ১২৬টির পরিবর্তে ৩৬টি যুদ্ধবিমান কেনা হচ্ছে?

এর প্রধান কারণ অর্থ। ২০১৪ সালেই যেখানে ১২৬টি যুদ্ধবিমানের খরচা পড়ছিল $ ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, নরেন্দ্র মোদীর চুক্তি সই করার সময় সেটাই গিয়ে দাঁড়াতো $ ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বা প্রায় ২৭৪০০০ কোটি টাকায়।

২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪০৪০০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১০৯০০০ কোটি টাকা যায় পেনশন দিতে। বাকি ২৯৫০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৬৭ শতাংশ মানে প্রায় ১৯৮০০০ কোটি যায় বর্তমান কর্মচারীদের মাইনে দিতে। তাহলে মাত্র ৯৭০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকে নতুন যুদ্ধাস্ত্র, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম কেনার জন্য। সেখানে ১২৬টি বিমান কেনার খরচাই পড়ে যাচ্ছে ২৭২৪৬৯ কোটি টাকা।

(২) সরকার ৩ গুণ বেশি দাম দিচ্ছে।

এই অভিযোগটিও সর্বৈব মিথ্যে। কাতার এবং মিশর যথাক্রমে ১৮টি এবং ২৪টি রাফাল যুদ্ধবিমান কিনেছে। ফরাসি সরকার তাদের ওয়েবসাইটে স্বীকার করেছে যে, কাতার তাদের ১৮টি বিমানের জন্য মোট ৬.৩ বিলিয়ন ইউরো অর্থাৎ প্রায় $ ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচা করেছে। সেক্ষেত্রে কাতারের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিমানের দাম পড়েছে $ ২৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর মিশরের ক্ষেত্রে পড়েছে $ ২৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নরেন্দ্র মোদী ৩৬টি রাফায়েল জেটের জন্য চুক্তি করেছেন $ ৮.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে অর্থাৎ প্রতিটি বিমান পিছু খরচা পড়েছে $ ২৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এবার ভারতের ক্ষেত্রে একটু প্রাইস ব্রেক আপটি দেখা যাক।

সাংবাদিকদের জানানো হয়েছিল যে, ভারতীয় বিমানবাহিনীকে রাফাল ২৮টি একক আসন বিশিষ্ট (দাম ∈ ৯১.০৭ মিলিয়ন ইউরো) এবং বাকি ৮টি দুই আসনবিশিষ্ট বিমান দেবে (দাম ∈ ৯৪ মিলিয়ন ইউরো) মোট ৩৬টি রাফালের জন্য ব্যয় হবে ∈ ৩.৩ বিলিয়ন ইউরো।

এছাড়াও ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য সুবিধার (India-Specific Enhancement (required by the IAF) খরচা ধরা হয়েছে ∈ ১.৮ বিলিয়ন ইউরো, অস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য ∈ ৭০০ মিলিয়ন ইউরো এবং পারফরম্যান্স ভিত্তিক সরবরাহের জন্য ∈ ৩৫০ মিলিয়ন ইউরো যা নিশ্চিত করবে যে ৭৫ শতাংশ রাফাল কার্যকরীভাবে সবসময় পাওয়া যাবে। এই সব মিলিয়ে খরচ দাঁড়ায় ∈ ৪.৫ বিলিয়ন ইউরো।

মোট খরচ দাঁড়ালো ∈ ৭.৮৭ (৩.৩ + ৪.৫) বিলিয়ন ইউরো বা $ ৮.৯৪ মার্কিন ডলার। তাহলে দেখা যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদী সরকার মাত্র ৭.৮৭ বিলিয়ন ইউরোতে পেয়ে গেল :

৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান
MICA ক্ষেপণাস্ত্র
Meteor ক্ষেপণাস্ত্র
সবরকম অস্ত্রের প্যাকেজ



দাসোর কারখানায় নির্মলা সীতারামণ।

Performance-based logistics সাপোর্ট

ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী ১৪টি সুযোগ-সুবিধা (India-Specific Enhancement)

অতএব কংগ্রেসের তোলা এই অভিযোগটিও খাটে না।

(৩) **HAL এর বদলে Reliance Defence কে কেন সহযোগী করা হলো?**

আদপেই কি তা ঘটছে? দেখা যাক।

ইউপিএ-২ আমলে যখন ১২৬টি রাফাল জেট কেনার কথা চলছিল তখন অবশ্যই HAL ভারত সরকার এবং Dasseult Rafale কোম্পানির মধ্যে হওয়া Contract Negotiation Committee তে ছিল, যেহেতু প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল যে ১০৮টি জেট Dassault Rafale-HAL যৌথ উদ্যোগে এদেশে তৈরি হবে। কিন্তু প্রথম থেকেই HAL-এর Dassault Rafale-এর চেয়ে তিনগুণ বেশি শ্রম-ঘণ্টা লাগছে। ফলে সময় আর খরচ দুটোই বাড়ছে। তাছাড়া HAL-এর সামরিক পণ্য তৈরি করার সুনাম নেই। এর আগে ২০১৫ সালে বোয়িং সংস্থাও HAL এর সঙ্গে চুক্তি রদ করেছিল খারাপ গুণগত মানের জন্য। সঙ্গত কারণেই এনডিএ সরকার এতে যেতে যায়নি।

এবার আসি ৩০০০০ কোটি টাকার Offset clause-এর কথায়। কংগ্রেস একটি মিথ্যে প্রচার করে চলেছে যে রিলায়েন্স ডিফেন্স পুরো অর্ডারটি পেয়েছে। বস্তুত এর সিংহভাগ অর্ডারটি পেয়েছে ভারত সরকারের The Defence Research and Development Organisation (DRDO)। রাফাল জেটের ইঞ্জিন তৈরির সংস্থা Snecma's (M88 engine) DRDO এর সঙ্গে আলাদা চুক্তি করেছে ভারতে তৈরি কাবেরী ইঞ্জিনকে পুনর্জীবিত করার জন্য। এতে সামরিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে একটি আলাদা দিগন্ত খুলে যাবে।

অনেকেই হয়তো জানেন না যে, একটি যুদ্ধবিমানের বিভিন্ন অংশ তৈরি করে বিভিন্ন কোম্পানি। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লকহেড মার্টিন তাদের F-16 বিমানের ক্ষেত্রে GE-র ইঞ্জিন ব্যবহার করে আবার F-22-র ক্ষেত্রে প্র্যাট-হুইটনি। বোয়িং তাদের F-18 এর জন্য ব্যবহার করে GE। তেমনি Dassault Rafale ইঞ্জিন ব্যবহার করে Snecma সংস্থার M88 engine, রাডারের ক্ষেত্রে Thales এর RBE2 AESA এবং অস্ত্রের ক্ষেত্রে MBDA ইঞ্জিন। ভারত সরকারকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়েছে। আবার Dassault Rafale কেও Offset clause পূরণ করতে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়েছে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যার মধ্যে Reliance Defence ছাড়াও রয়েছে Mahindra, Samtel, BTSL Automotive India, Defsys Solutions, Maini Aerospace এবং Kinetic India। সব মিলিয়ে আর্থিক মূল্যে যার পরিমাণ মাত্র ৬৫০০ কোটি টাকা। স্বাভাবিকভাবে Reliance Defence-কে এখানে দায়ী করা অর্থহীন।

এবার আসছি শেষ অভিযোগ অর্থাৎ Defence Procurement Procedure (DPP) বা প্রতিরক্ষা সংগ্রহ পদ্ধতি ভাঙার প্রসঙ্গে।

প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি বা Defence Procurement Procedure (DPP) ২০১৩-তে উল্লেখ করাই ছিল যে ভারত সরকার চাইলে যুদ্ধবিমান ক্রয়ের সংখ্যা পরিবর্তন করতেই পারে। এছাড়াও বলা হয়েছিল যে মূল প্রস্তুতকারক সংস্থার (এক্ষেত্রে Dassault Aviation) এদেশে তার Offset অংশীদার চয়নের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি বা Defence Procurement Procedure (DPP)-তে বলা হয়েছিল যে আন্তঃসরকারি চুক্তি বা inter- governmental agreement-র ক্ষেত্রে কোনও দরপত্রের প্রয়োজন হবে না। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে C-17 বিমান কেনার সময়ও কোনও দরপত্র ডাকা হয়নি।

Through offset banking as per guidelines in para 5.8.

4. Indian Offset Partner

4.1 Indian enterprises and institutions and establishments engaged in manufacture of eligible products and or provision of eligible services, including DRDO, are referred to as the Indian Offset Partner (IOP).

4.2 The Indian offset patner shall, besides any other regulations in force, also comply with the guidelines/ licensing requirements stipulated by the Department of Industrial Policy and Promotion as applicable.

4.3 The OEM/vendor/Tier-I sub-vendor will be free to select the Indian offset partner for implementing the offset obligation provided the IOP has not been barred from doing business by the Ministry of Defence.

4.4 The agreement between the OEM/vendor/Tier-I sub vendor and the IOP shall be subject to the laws of India.

এর থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে রাহুল গান্ধীর দেশের সুরক্ষার প্রশ্নেও আপোশ করতে বাধছে না। সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করে কংগ্রেস রাজনৈতিক লাভ ওঠাতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে আপামর দেশবাসীকে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করতে হবে।

তিন দেশের তুলনামূলক মূল্য তালিকা

দেশ	বিমানের সংখ্যা	মোট মূল্য (পাউন্ড বিলিয়ন)	পিপিইউ (পাউন্ড মিলিয়ন)	টট	অফসেট	রক্ষণাবেক্ষণ	বাড়তি সুবিধা
ইজিপ্ট	২৪	৫.২	২১০	না	না	না	না
কাতার	২৪	৬.৩	২৬২	না	না	না	না
ভারত	৩৬	৭.৮৭	২১৮	না	৫০ শতাংশ	৭৫ শতাংশ প্রয়োগ ক্ষমতা	হ্যাঁ

দেশের নিরাপত্তা বানচালের চক রাহুলের রাফাল ইস্যুতে

অভিমন্যু গুহ

ভারতীয় রাজনীতিতে রাহুল গান্ধী বহুকালই হাসির খোরাক। ২০০৪ সালে যেদিন সোনিয়া গান্ধী নিজের 'বিদেশিনী' ইস্যুকে আড়াল করতে মনমোহন সিংহকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসালেন, সেটা ছিল আসলে তুরুপের তাস। একদিকে বিদেশিনী প্রসঙ্গ দূরে সরে গিয়ে তিনি কত নির্লোভ 'মহিয়সী' তা যেমন প্রমাণ করার সুযোগ পাওয়া গেল, অন্যদিকে রাহুল গান্ধীকে ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরার পথটিও সুগম করা হলো। কিন্তু এই অপরিণত-বুদ্ধি রাহুলকে তার পরবর্তী ২০০৯-এর নির্বাচনেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দাঁড় করানোর বিশেষ সুবিধা হয়নি। কারণ রাহুলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুধু যে দায়সারা ছিল তা-ই নয়, দেশের সাধারণ জনগণের কাছে ততদিনে তিনি হাসির পাত্র হয়ে উঠেছেন। এরপর এল ২০১৪ সাল। কংগ্রেস- তাঁবেদার মিডিয়া পারলে রাহুলকে প্রধানমন্ত্রীর তখতে বসিয়েই দেয়। তারপর যা হয়েছে সে তো সবাই জানেন। জরুরি অবস্থার সময়, যখন চারিদিকে কংগ্রেসের প্রতি সাধারণ মানুষের যথেষ্ট ঘৃণা, তখনও নির্বাচনে কংগ্রেসের এই হাল হয়নি। প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী রাহুলের ভাগ্যে ৪৪টা আসন জুটেছিল, বিরোধী দলনেতার তকমার পক্ষেও এই সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না।

২০১৪-য় নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতটা ভালো কাজ হয়েছে, আর কতটা ভালো হয়নি, সে বিচার তো সময়ই করবে। কিন্তু একটা মোক্ষম কাজ হয়েছে, সেটা হলো দেশবাসী আজ উপলব্ধি করতে পেরেছেন এই দেশটা নেহরুর পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ওই ব্যক্তিটির কানাকড়িও অবদান ছিল না। এতকাল সযত্নে লালিত মিথ্যা ও জাল ইতিহাসের রশিতে টান পড়তেই গেল গেল রব উঠেছে। ভারতবাসীকে ইতিহাস ভোলাতে নেহরুর কৃতিত্ব অনেকখানি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা থেকেই উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেস ছিল আদতে জাতীয়তাবাদী। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখের সুবাদে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য বজায় ছিল কিন্তু স্বাধীনতার পরে পাশাটা উল্টে দিলেন নেহরু।

যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো জাতীয়তাবাদী



নাগপুরে দাসো-রিলায়েন্সের ফ্যাক্টরির উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

ঘরানার প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের বাদ দিয়ে বামপন্থী ঐতিহাসিক তৈরির কাজ শুরু হলো। নেহরু খুব ভালো করেই জানতেন, এদের সযত্নে লালন করতে পারলে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস মুছে যাবে এবং তাঁর নামই ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করতে থাকবে। নেহরুর পরিকল্পনায় কোনও খামতি ছিল না, বর্তমানে দেশে যে নৈরাজ্য সৃষ্টির পরিকল্পনা চলছে তা মূলত নেহরুর বিষবৃক্ষের ফললাভেই। মোদী সরকার চেষ্টা করছে এই বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটনে, ফলে হরেক কিসিমের ধান্দার লোকজন আজকে এক ছাতার তলায় এসেছে। রাহুল গান্ধীর ভয়টা অন্যখানে। তিনি খুব ভালো করেই জানেন নেহরু পরিবারের তৈরি করা মিথ্যে ইতিহাসের ভিত একবার নড়ে গেলে এই দেশে রাজ্যপাট রক্ষা করা তো দূরের কথা, পঞ্চায়েত স্তরেও নিজে জেতার ক্ষমতা তাঁর থাকবে না।

রাহুল কোনওদিনই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ অবগত ছিলেন না। বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে রাজীবের মৃত্যুর পর এই পরিবারটি রাজনীতি থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বের গদি যাওয়ার পর কংগ্রেসের হাঁড়ির হাল হয় সীতারাম কেশরীর আমলে। তখন নেহরু পরিবারের চাটুকাররা বুঝেছিল নেহরু পরিবারের জুজু না থাকলে দলটা উঠে যাবে। সেই সূত্রেই সোনিয়া আর পরে রাহুলের ভারতীয় রাজনীতিতে আসা। রাহুলের পড়াশুনো বিদেশে। সেখানে তার প্রেম-কাহিনির কথাও কিছু শুনতে পাওয়া যায়। নেহরু পরিবারের দখলদারি কায়েম রাখতেই আচমকা এক অপরিণত, অদূরদর্শী দৃষ্টি নিয়ে এদেশের রাজনীতিতে তিনি এসেছেন। এবং তাঁর আসার পরে এখনও অবধি যা কিছু হয়েছে, তা দেশের পক্ষে কোনও মতেই শুভ নয়। একটা সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাক। সংসদ হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত আফজল গুরুকে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া ফাঁসির আদেশ রাতারাতি কার্যকর করেছিল মনমোহন সিংহ সরকার। এমনকী আফজলের পরিবারকে খবর না দেওয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও উঠেছিল তাদের বিরুদ্ধে। অথচ জে এন ইউতে এই আফজল গুরুর জন্মদিন পালনের অভিযোগ উঠল যাদের বিরুদ্ধে সেই কানহাইয়া কুমার ও উমর খালিদের সঙ্গে একজোট হয়ে গলা মেলাতে দেখা গেল রাহুল গান্ধীকে। ভারতীয় রাজনীতিতে এই হাস্যকর পদার্থটিকে তারপর থেকেই একশ্রেণীর অতিবাম পরিচালিত সংবাদমাধ্যম 'নেতা' হিসেবে তুলে ধরতে উঠে পড়ে লেগেছে।

রাফাল-ইস্যুর বিষয়টিও অনেকটা সেরকম। গত বাদল অধিবেশনেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল রাহুল গান্ধী একজন ডাহা মিথ্যেবাদী। ফরাসি সরকার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস সভাপতি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে উদ্ধৃত করে যা বলছেন, ফরাসি রাষ্ট্রপ্রধান তেমন কোনও কথাই বলেননি। সেই সঙ্গে ফরাসি সরকারের পক্ষ থেকে এও জানানো হয় যে দু'দেশের অস্ত্র কেনা-বেচা সংক্রান্ত চুক্তি একান্ত গোপনীয়, কারণ এতে উভয় দেশের নিরাপত্তাই জড়িত আছে এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কূটনৈতিক দৌত্যের পক্ষেও এটি দরকারি।

ফরাসি সরকারের এই বিবৃতির পর স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতরামন যা বলেছেন তাতে কোনও ভুল নেই। তিনি প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন এই চুক্তির পেছনে গোপনীয়তা বজায় থাকবেই কারণ এতে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থ জড়িত আছে। অথচ ফ্রান্স সরকারের এই বিবৃতি কীভাবে 'ব্ল্যাকআউট' করা যায় তার নমুনা এদেশের একশ্রেণীর অতিবাম পরিচালিত সংবাদমাধ্যম দেখিয়েছে। রাহুল প্রধানমন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরছেন সেটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখানো হলো। রাহুল কত মহান তাও তুলে ধরা হলো। কিন্তু তারপরেই নিজের চেয়ারে ফিরে চোখ টেপার মতো কাণ্ড ঘটিয়ে ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে যে ইতরামির নজির তিনি স্থাপন করলেন সেটা যথাসম্ভব চেপে যাওয়া হলো। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিন্দা শুরু হতে রীতিমতো মশকরা করে বিষয়টি হাল্কা করে দেওয়া হলো। দেশের নিরাপত্তা নিয়ে যে তাঁর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, রাহুল





নরেন্দ্র মোদী ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ওলাঁদ।

আফজল গুরু কাণ্ডেই তার প্রমাণ দিয়েছেন। ডোকলাম নিয়েও রাহুল উচ্চগ্রামে কথা বলেছেন। যখন লন্ডনে এক সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকলে কীভাবে সমস্যা মেটাতেন, তখন রাহুল বলেন তিনি সমস্যার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত নন! রাহুল আমেরিকায় গেলে ভারতীয় বাহিনীর নিরাপত্তা ছেড়ে সি আই এ-র হেফাজতে নিজেকে সঁপে দেন কেন? তারও সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি। দেশের নিরাপত্তা-ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করার গুণটি তিনি নেহরুর থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। স্বাধীনতার পর জেনারেল রয় বুথসার নেহরুকে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ ও এর প্রসারের জন্য বলেছিলেন। চীন-পাকিস্তান শত্রু পরিবেষ্টিত নেহরু সরাসরি সেনা-প্রধানকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ভারতের কোনও শত্রু আছে বলে তিনি মনে করেন না, তাই সেনাবাহিনীকে উন্নত করার প্রয়োজন নেই।

ভারতবর্ষকে অশান্ত করে বিদেশি এজেন্ট হিসেবে নিজেদের আখের গোছানো ছাড়া ভারতবর্ষে শহুরে নকশালদের কোনও কাজ নেই! এরা নিজেদের লক্ষ্য চরিতার্থ করবার জন্য রাহুলকে বেছে নিয়েছে। কানহাইয়া-উমর দিয়ে শুরু, জিগনেশ মেগানি-হার্দিক প্যাটেল থেকে মহারাষ্ট্রে নিরীহ কৃষকদের উত্তেজিত করে তোলা— সমস্ত দেশবিরোধী কাজে রাহুলের মুখের কোনও বিকল্প আরবান- নকশালরা খুঁজে পায়নি। একদা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের আজ এমনই হাল। বাবার বফর্স কেলেঙ্কারির সময় রাহুল দুগ্ধপোষ্য হলেও 'মামা' কাত্রোচ্চি আর মামার বাড়ির সূত্রে অপরিণত বুদ্ধিতেও এটুকু অন্তত বুঝে গিয়েছে যে ভারতবর্ষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে আখেরে তাদের পরিবারের রাজ্যপাট রাখতেই সুবিধা হয়।

তাই রাফাল ইস্যুকে সামনে রেখে রাহুল এক ঢিলে অনেকগুলি পাখি মারার পরিকল্পনা করেছেন। এক, ভারতের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে দেওয়া। দুই, বফর্সের সূত্রে তিনি বুঝেছেন ওই কেলেঙ্কারি যদি রাজীবের গদি নড়িয়ে দিতে পারে, তবে 'রাফাল' ইস্যু তৈরি করলে সেটা মোদীর বফর্স হয়ে উঠবে না কেন? তিন, ভারতের রাজনীতির জল ঘুলিয়ে মাছ ধরার চেষ্টায় রাফালই তাঁর শেষ সম্বল। কারণ দেশের অর্থনীতি কংগ্রেস আমলে কী বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল, বিশেষ করে দুর্নীতি ইস্যুতে, তারপর কংগ্রেসের মুখে বিজেপির আমলে দেশের অর্থনীতির বিপর্যয়ের গল্প শুনতে অনেকেই যে চান না— এটা রাহুল বুঝেছেন।

অগত্যা রাফাল! সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো রাহুলের এই চিল চিৎকারে দেশবাসীর যে বিশেষ কান সেই, সেটা একটি জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে। আরও মজার বিষয়, এই জনমত সমীক্ষা করা হয়, মূলত মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে নকশালগোষ্ঠী পরিচালিত বাংলার একটি সংবাদমাধ্যম এই তিনটি রাজ্যকেই কংগ্রেসের হাতে তুলে দিতে ব্যগ্র ছিল, কিন্তু সময় গড়াতে বুঝতে পেরেছে ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ হলো কঠিন ঠাঁই। তাই তাদের জনমত সমীক্ষায় ওই দুই রাজ্যে বিজেপিরই প্রত্যাবর্তনের জোরালো সম্ভাবনা। অগত্যা কাঁচুমাচু মুখে তারা বলেছে রাফাল ইস্যুর সঙ্গে নাগরিকদের অধিকাংশেরই পরিচিতি নেই, তাই নাকি নির্বাচনে বিজেপির সুবিধা।

আসলে এই ধরনের নকশাল গোষ্ঠীগুলি কিংবা তাদের বোড়ে রাহুল গান্ধী দেশবাসীকে মূর্খ ভাবতে পারেন। কিন্তু তাঁদের চিনে নিতে ভারতবাসীর যে ভুল হয়নি তা তো গত লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণিত সত্য। আর যেটুকু বা মুখোশের আস্তরণ ছিল, আগামী লোকসভার আগে সেটুকুও খসে পড়ছে। তাই রাফাল ভবীতে ভুলছেন না দেশবাসী। ■

শ্রদ্ধা'র ১০৮ তম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান



গত ১১ নভেম্বর সিউড়ী নগরের সেহাড়াপাড়ার সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর নিজ ভদ্রাসনে শ্রদ্ধার উদ্যোগে ১০৮তম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের জেলা সম্পাদক ও পূর্বতন প্রচারক বিশ্বনাথ দে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে পা ধুইয়ে চন্দন, ফুল, তুলসী দিয়ে পূজা করেন তার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অসীমা মুখার্জি। শ্রদ্ধার পক্ষে সহযোগিতা করেন কুমারী শুভ্রা ঘোষ। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন পল্লব বৈরাগ্য। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বীরভূম জেলা সংশোধনাগারের অধিকর্তা সুজিত পাল তাঁর সুললিত কণ্ঠে দুটি গান পরিবেশন করেন। এরপর রূপা ঘোষাল ও অলকা গাঙ্গুলি গান পরিবেশন করেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ গীতা, পরিধেয় বস্ত্র, নামাবলী, ফল ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। মাল্যদান করেন শ্রদ্ধার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিক্ষিকা শ্রীমতী চৈতালী মিশ্র। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বেণীমাধব উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

ডিডওয়ানা নাগরিক সভার দীপাবলী প্রীতি সম্মেলন

কলকাতার প্রখ্যাত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ডিডওয়ানা নাগরিক সভার উদ্যোগে গত নভেম্বরে দীপাবলী প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রমেশচন্দ্র লাহোটিকে 'ডিডওয়ালা গৌরব' সম্মানে ভূষিত করা হয়। তাঁকে চন্দন, শ্রীফল, শাল, স্মারক চিহ্ন ও মাল্যার্পণে বিভূষিত করেন



ওমপ্রকাশ বাঙ্গড়, ঈশ্বর ধ্যাওয়ালা, অরুণ মল্লাবত, ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী, বেণুগোপাল ত্রিপাঠী প্রমুখ। প্রীতি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি বেণুগোপাল বাঙ্গড়। প্রধান অতিথি হিসেবে অখিল ভারতবর্ষীয় মাহেশ্বরী মহাসভার অধ্যক্ষ শ্রীশ্যাম সোনী, প্রধান বক্তা হিসেবে বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে গুরংগ্রামের রমেশ বাঙ্গড়, ফরিদাবাদের ওমপ্রকাশ পসারী ও মুম্বইয়ের নারায়ণ পসারী উপস্থিত ছিলেন। প্রীতি সম্মেলনে ২৪ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে 'স্বর্গীয় পসারী স্মৃতি শিক্ষা-প্রতিভা সম্মান' দেওয়া হয়। তাদের সবাইকে রৌপ্যপদক, শংসাপত্র এবং পুস্তক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার সম্পাদক হরীশ তিওয়ারী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার অধ্যক্ষ অরুণ মল্লাবত।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

মালদায় বিদ্যার্থী সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে গত ১৮ নভেম্বর মালদা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় উচ্চ শিক্ষারত বিদ্যার্থী সম্মেলনে। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ অরুণ কুমার। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মালদা বিভাগ সঙ্ঘচালক সুভাষ কুমার দাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং গবেষণারত ২৩৫ জন ছাত্রের



উপস্থিতিতে অরুণ কুমারজী দেশের সুরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও ভারত বিরোধী শক্তির গতিবিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শেষে তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সমাজসেবী রুগলাল সুরানার স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

গত ২৩ নভেম্বর কলকাতার বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বর্গীয় রুগলাল সুরানা জৈনের স্মৃতিতে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করা হয় স্থানীয় অসোয়াল ভবনের সভাকক্ষে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শার্দুল সিংহ জৈন। স্মরণ সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ে অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী, স্থানীয় বিধায়ক শ্রীমতী স্মিতা বকসী, ভূতপূর্ব উপমহাপৌর বর্তমানে পার্ষদ শ্রীমতী মীনাদেবী পুরোহিত, রাষ্ট্রীয় মহানগরের সম্পাদক প্রকাশ চণ্ডালিয়া, সেবা সংসারের সম্পাদক সঞ্জয় হরলালকা, রাজস্থান পরিষদের মহামন্ত্রী অরুণপ্রকাশ মল্লাবত, রাজনেতা সজয় বকসী, সমাজসেবী রাজেশ সিনহা। উপস্থিত বক্তারা এবং সভায় আগত সবাই প্রয়াত সুরানার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সভা পরিচালনা করেন বংশীধর শর্মা। কলকাতার বিভিন্ন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সমস্ত পদাধিকারীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রামপুরহাটে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের দীপাবলী সম্মেলন



গত ১৮ নভেম্বর বীরভূম জেলার রামপুরহাটে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মঞ্চের বিজয়া ও দীপাবলী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১০৫ জন শিক্ষক ও অধ্যাপক প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন— বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রণব কুমার চ্যাটার্জি, অধ্যাপক সুকুমার পাল, শিবপুর কলেজের অধ্যাপক সঞ্জীবকুমার রায়, অধ্যাপক আশিসকুমার পাল, অধ্যাপক বিপুল সরকার, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা সভাপতি বামাচরণ রায়, শিবাজী প্রসাদ মণ্ডল, নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের শিক্ষক তুলারাম মণ্ডল প্রমুখ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিক্ষক রামকৃষ্ণ মণ্ডল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সঙ্ঘের জেলা সম্পাদক প্রহ্লাদচন্দ্র মণ্ডল। সংবর্ধনা প্রদান করা হয় বিশিষ্ট শিক্ষক অশোক কুমার ঘোষকে।





মহাকুম্ভ মহামিলন

অমিত ঘোষ দস্তিদার

জীবনের সমস্ত চাওয়া পাওয়া এক ফুৎকারে উড়ে যায় যখন শাস্ত্র জানায়— 'সংসারে শ্মশানের তীরদেশে অবস্থিত থাকিয়া যাহা ত্রিতাপদগ্ধ জীবের প্রাণে অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত আনন্দ ও নিখিল কল্যাণের নিলয় পরমাত্মার অনির্বচনীয় পরশ বুলাইয়া দেয়— তাহাই তীর্থ। তীরে অবস্থান হেতু তাকে বলা হয় তীর্থ।' সবকিছু ফেলে মানুষ তখন ত্যাগে সিক্ত গেরুয়া জলে ডুব দেয়। নিজ দেহ চুলকে দেশজ আত্মায় চিমটি কেটে আনন্দ পান যেসব জ্ঞানীগুণীজন, তাঁদের চোখে— কুম্ভের নামে এক অবুঝ ও অবিশ্বাস্য উন্মাদনা যুগ থেকে যুগান্তরে (একইভাবে) অবিশ্বাস্যভাবে বয়ে চলেছে, সীমাহীন বিস্ময়ের অবগুণ্ঠনে থাকা তাঁদের চোখ পলক ফেলতেই ভুলে যায়।

কৈলাসে বসে হর-পার্বতী পূর্ণকুম্ভ প্রত্যক্ষ করেছেন। মহাভারতের যুগে যার আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা ছিল জগৎ সংসারের চন্দ্র-সূর্যের মতোই অনস্বীকার্য। গড়ুরপুরাণে যার উল্লেখ আছে। যে মহামিলনের আয়োজন হর্ষবর্ধন (৬০৬ খ্রি.-৬৪৭ খ্রি.) করেছেন। যার প্রত্যক্ষ রূপ হিউয়েন সাঙ (৬৪৪ খ্রি.) দেখেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গির তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি'-তে যে মহামিলনের বর্ণনা করেছেন, তৈমুরলং যে এই মহামিলন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা আলউতবি সফরউদ্দিন উল্লেখ করে গেছেন, আলবিরুণী, রসিদউদ্দিন প্রমুখ মুসলমান ঐতিহাসিক উল্লেখ করে গেছেন এই মহান মহামিলনের। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কালকূট প্রমুখ একে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছেন তাঁদের অমূল্য লেখায়।

বিশ্বাসই অমৃত। আর এই বিশ্বাসের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে মহাকুম্ভের প্রাসাদ। কুম্ভমেলা ভারতের সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রাচীন ধর্মীয় মেলা। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের সময় সূর্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি অমৃতকুম্ভ রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তাই এই তিনের সংযোগ-বিশিষ্ট রাশিতে অবস্থানকালে কুম্ভযোগ ঘটে। বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে এবং সূর্য মেষ রাশিতে অবস্থান করলে অমৃতকুম্ভ যোগ ঘটে হরিদ্বারে। বসন্তকালে বিষুব সংক্রান্তিতে সূর্যের মেষ রাশিতে সংক্রমণ এবং বৃহস্পতির কুম্ভরাশিতে অবস্থানকালে হরিদ্বারে পরম পুণ্যপ্রদ কুম্ভযোগ হয়। বৃহস্পতি যখন মেষ রাশিতে এবং চন্দ্র ও সূর্য মকর রাশিতে অবস্থান করেন, তিথি হয় অমাবস্যা তখন তীর্থরাজ প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয়। বৃহস্পতি ও সূর্য যখন উভয়ে কুম্ভরাশিতে গমন করে, তখন নাসিকে গোদাবরী তটে কুম্ভযোগ হয়। সূর্য যখন মেষ রাশিতে এবং বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন ধরাধামে সর্ব মানবসম্মুখে সুখপ্রদ কুম্ভযোগ হয়। এটি সিংহস্থ কুম্ভযোগ নামেও খ্যাত। তুলা রাশিতে বৃহস্পতি, সূর্য ও চন্দ্র অবস্থান করলে অমাবস্যা তিথিতে উজ্জয়িনী-শিপ্রাতটে মুক্তিপ্রদ কুম্ভযোগ হয়।

'কুম্ভ' শব্দটি শাশ্বত ভারতের প্রতীক। পুরাণ কথিত ধারা নানা পুরাণে নানাভাবে ব্যক্ত। তার মধ্যে অন্যতম একটিতে বলা হয়েছে, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অমৃতকুম্ভ লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে চার জায়গায় রেখেছিলেন। সেই চার জায়গা হলো হরিদ্বার, প্রয়াগ, গোদাবরী তটে নাসিক এবং শিপ্রার কূলে উজ্জয়িনীতে। সেই কারণে এই চারস্থানে অমৃতের উদ্ভব হয়। কুম্ভমেলার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো অমৃতের সন্ধান। এই তীর্থের এক অপরিহার্য অঙ্গ বা কৃত্য হলো স্নান। শাস্ত্রে ত্রিবিধ তীর্থের উল্লেখ আছে। স্থাবর বা ভৌমতীর্থ, জঙ্গমতীর্থ এবং মানসতীর্থ। তীর্থস্থানের পরিপূর্ণ সফলতা এই ত্রি-তীর্থের সম্মিলনেই সম্ভব। কুম্ভমেলাই সেই স্থান, যেখানেই এই মিলন ঘটে। কুম্ভমেলার স্থানগুলি হলো— হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক এবং উজ্জয়িনী। এই সবকটি তীর্থই পবিত্র নদীর দ্বারা স্নাত যেমন গঙ্গায় স্নাত হরিদ্বার, যমুনায় স্নাত প্রয়াগ, গোদাবরী দ্বারা স্নাত। নাসিক এবং শিপ্রা নদী দ্বারা স্নাত উজ্জয়িনী। গড়ুর পুরাণে উল্লিখিত সপ্তমোক্ষ, তীর্থের অন্যতম হরিদ্বার। হরিদ্বার বা হর-র দ্বার যাই-ই হোক না কেন বৈষ্ণব ও শৈব উভয়ের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসার তীর্থ হরিদ্বার। হরিদ্বার বা হরদ্বার বা মায়াপুর

আধ্যাত্মিকালোকের দুয়ার। পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতি এখানে বাস করেছেন। ঋষি পুলস্ত্য তীর্থ মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বারে পিতামহ ভীষ্মকে বলেছিলেন : 'মহাবাহু। পুরাণ মতে ব্রহ্মাপ্রজাপতির যজ্ঞক্ষেত্র প্রয়াগ'। রামায়ণ বলছে প্রয়াগ ভরদ্বাজ চ্যবন অগস্ত ঋষির তপস্যা ক্ষেত্র। রাম-সীতাও এখানে তীর্থ দর্শন করতে এসেছিলেন। হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জয়িনীর পুণ্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে কোটি কোটি মানুষ পূর্ণকুম্ভকে তাদের শরীরস্থ কলসে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে আসছে।

ধর্মীয় অবক্ষয়ে এক চরমক্ষণে যুগস্রষ্টা দাক্ষিণাত্যের দণ্ডিধারী আচার্য শঙ্কর ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে জন্ম নিলেন। অসীম প্রতিভা, অপরিসীম জ্ঞান ও মেধার অধিকারী হয়ে তিনি তিব্বত-সহ সমগ্র ভারত পরিক্রমা করে কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে অদ্বৈত বেদান্ত মতবাদে সমস্ত মতাবলম্বী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে একসূত্রে গ্রথিত করে 'বিধর্মীদের হাত থেকে ধর্ম রক্ষার জন্য সাধু-সৈনিক 'দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়' সৃষ্টি করলেন। স্থাপন করলেন ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ। চারটি বেদ নির্দিষ্ট করলেন চারটি মঠের জন্য। দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ, জ্যোতির্ধামে যোশী মঠ এবং সহ্যাদ্রিপর্বতে শৃঙ্গেরী মঠ। সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটকাচার্য এবং হস্তামলক নামের স্বনামধন্য শিষ্যগণ যথাক্রমে মঠগুলির দায়িত্বভার লাভ করেন। দশটি শাখার সন্ন্যাসীদের এই চারটি মঠের অধীনে রেখে আচার্য তাঁদের সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। তাঁর এই সংস্কার ব্যবস্থা একদিকে যেমন সন্ন্যাস আশ্রমের শক্তি বৃদ্ধি করেছে, তেমনি ভারতের পুরাতন সমাজ জীবনের সামনে তুলে ধরেছে পরম কল্যাণময় আদর্শ। আচার্য প্রতিষ্ঠিত চারটি মঠ থেকেই দশনামী সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি হয়। দ্বারকায় সারদামঠ। এঁদের দুটি সঙ্ঘ— তীর্থ ও আশ্রম। মহাবাক্য— 'তত্ত্বমসি' মন্ত্র। পুরীধামে গোবর্ধন মঠ। এঁদের দুটি সঙ্ঘ— বন ও অরণ্য। মহাকাব্য— 'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'। তৃতীয় জ্যোতির্ধামে— যোশীমঠ। এঁদের তিনটি সঙ্ঘ— সরস্বতী, ভারতী, পুরী। মহাবাক্য— 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। চতুর্থ— শৃঙ্গেরী মঠ। অবস্থান কর্ণাটকের পর্বতমালা । সঙ্ঘ এখানে তিনটি— গিরি, পর্বত, সাগর। মহাবাক্য— 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি।' এই দশনামী সম্প্রদায়ের সাতটি আখড়া— নিরঞ্জনী, নির্বাণী, আবাহন, জুনা, অটল, অগ্নি, নির্মল। এই সাতটি আখড়া নিয়ে গঠিত হয়েছে দশনামী নাগা সন্ন্যাসীর আখড়া। ধর্মরক্ষার জন্য নাগাসন্ন্যাসীরা সশস্ত্র থাকেন। তাঁদের লড়াইয়ের প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। লড়াই হলে প্রতিপক্ষকে গোড়াতেই হকচকিয়ে দেওয়ার জন্য তারা নাঙ্গা বা উলঙ্গ। ভারতে এখন তেরটি নাগা আখড়া আছে বলে জানা যায়।

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের দর্শনের মূলমন্ত্র— জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম— আবহমান কালের এই জাগতিক চক্র থেকে মুক্তি পেতে হলে আত্মত্যাগ আর ভোগ পরিহারই শ্রেষ্ঠপথ। ভারতের আধ্যাত্মিক আত্মাই হলো কুম্ভ। সেই আধ্যাত্মিক আত্মাই অমৃত মন্থনের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সময়ে বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে চলেছে। আর সেই চলার পথে আজও ধ্বনিত হয়ে চলেছে 'বেদ'-এর অম্লান বাণী— 'আত্মানাং বিদ্ধি', আর সেই ধ্বনিই চিরন্তনভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে— মানবজীবনের লক্ষ্য। ■

অস্ত্র-পূজনের যৌক্তিকতা

রবীন সেনগুপ্ত

অনেকে প্রচার করেন যে হিন্দু ধর্মের প্রধান আদর্শ হলো— ত্যাগ, সহনশীলতা, প্রেমভক্তি ইত্যাদি। কাজেই যাঁরা অস্ত্র মিছিল ও অস্ত্র প্রয়োগ করছেন— তারা সবাই ভ্রান্ত। এই প্রচার কিয়দংশে সত্য হলেও বহুলাংশেই মিথ্যা। কারণ সনাতন হিন্দু ধর্মের অন্যতম উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে ক্ষমা



করেননি। তিনি তাকে অস্ত্রদ্বারা হত্যা করেছেন।

হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান ভগবান শিব। দক্ষরাজাকে ক্ষমা না করে তিনি তার যজ্ঞ ভঙ্গ করেছেন। শিবহীন যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী সকল সাধু ও দেবতাকেও শিবের গণেরা আঘাত করে প্রতিশোধ নিয়েছেন।

বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম তাঁর পিতা জমদগ্নিকে হত্যা করার অপরাধে ২১ বার ক্ষত্রিয় জাতিকে নিধন করেছিলেন।

মা দুর্গা ও মা কালী তো কোনও অসুরকেই ক্ষমা করেননি। মহিষাসুর, চণ্ড, মুণ্ড, শুম্ভ নিশুম্ভ— সকলকেই সসৈন্য বধ করেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম, দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করেছেন। পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, কালযবন ও পুতনাদের ক্ষমা না করে হত্যা করেছেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুন বলেছিলেন যে তিনি যুদ্ধে আত্মীয়দের হত্যা করে পাপের ভাগীদার হতে রাজি নন। তখন শ্রীকৃষ্ণ যদি বলতেন যে— হে অর্জুন আত্মীয়দের প্রতি তোমার এই প্রেম ও সহনশীলতা দেখে আমি বড়ই প্রীত হয়েছি। ঠিক আছে, তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে না। তুমি কুরুক্ষেত্রের এক পাশে ফাঁকা স্থান নির্বাচন করে সেখানে হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসাও— আর 'রাধা ভাবে' আপ্লুত হয়ে তিলক কেটে নাচতে থাকো। যুদ্ধটা তোমাকে ছাড়াই আমি সামলে নিচ্ছি— তাহলে অর্জুনও তাই করতেন।

কিন্তু না, তিনি তা বলেননি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন— যে তুমি ক্লীবতা ত্যাগ করে যুদ্ধ জয় পূর্বক নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর।

শিবাজী মহারাজ কি আফজল খাঁ ও ঔরঙ্গজেবের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন? স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কী ব্রিটিশদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন? নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি আই এন এ-র সেনাদের হাতে গোলাপ ফুল দিয়ে ভারত উদ্ধারের অভিযান চালিয়েছেন? না তা নয়। সকলেই অস্ত্র হাতে সংগ্রাম করে তবেই সফল হন।

কাজেই ত্যাগের সঙ্গে মাত্রা বজায় রেখে ক্ষমা ও উদারতার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে সশস্ত্র সংগ্রামও হিন্দুর ঐতিহ্য। ■

হারিয়ে যেতে চলেছে বঙ্গদেশের চর্ম শিল্প

চূড়ামণি হাটি

পশুর চামড়া শুকিয়ে কীভাবে তা ব্যবহারের উপযোগী করে নিতে হয়— এ বিদ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জন করেছে। শীতে বাঁচতে গায়ে জড়ানো থেকে চামড়ার উপর শোয়া-বসা সবই আসলে প্রাচীন রীতি। ধীরে ধীরে শুধু রূপের বদল ঘটেছে মাত্র। একই সঙ্গে ব্যবহারিক বৈচিত্র্যও বেড়েছে। চামড়া দিয়ে তৈরি হয় চর্ম-বাদ্য, জুতো, জ্যাকেট, হাতমোজা, বেল্ট, অস্ত্র রাখার খাপ, যে কোনও ধরনের ব্যাগ, জল নেওয়ার জন্য ভিস্তিওলাদের মশক, চাবুক, ধনুকের ছিলা, তাঁবু, রথের লাগাম, বল প্রভৃতি। প্রয়োজনে বাঁশ-বেতের তৈরি খাঁচায় চামড়ার আস্তরণ পরিয়ে ভেলা হিসাবে ব্যবহার। বর্তমানে চামড়ার টান টান সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে





নানা ভাবে তার প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে। প্রয়োজনে একটু অলংকৃত বা রঙিন চিত্রে সাজিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ অন্য কোনও বিষয়কে নতুন মোড়কে তুলে ধরা। এ ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে কলমদানি, ঘড়ির পেছন অংশ কিংবা ফ্রেমে বাঁধানো কোনও ছবি।

চর্ম শিল্পের প্রধান উপকরণ ভেড়া-ছাগল, গোরু-মোষ সহ বেশ কিছু জন্তুর চামড়া। কুকুর-শৃগালের চামড়া অস্পৃশ্য। চর্ম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগরেরা সামাজিক অবহেলার শিকার। একই সঙ্গে মহাজনের নিষ্ঠুর ব্যবসায়ী মনোভাব শিল্পীদের কাছে বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়ায়। আবার কাঁচা চামড়ার উপর নুন ছড়িয়ে খোলা আকাশের নীচে রাখার জন্য স্থান সংকট তাঁদের কাছে একটি বড় সমস্যা। গ্রামে মুচিরা যেমন ভাগাড় থেকে কাঁচা চামড়া সংগ্রহের কাজটি করে তেমনি মুসলমানরা কসাইখানা থেকে বড় অংশের চামড়া সংগ্রহের কাজটি করে পাঠিয়ে দেয় চর্ম পাকাই কেন্দ্র অর্থাৎ ট্যানারিতে। ক্ষুদ্র ট্যানারি অপেক্ষা সংগঠিত ট্যানারিগুলি বর্তমানে



ভালো অবস্থায় আছে। চীনারা এ কাজে বেশ দক্ষতা দেখিয়েছে। চামড়া কেনা বেচার কাজে যুক্ত মুচিরা এক সময় একক প্রচেষ্টায় চর্ম শিল্পকে গ্রামীণ চাহিদা অনুসারে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ঠিক তেমনি হাতে কাঠি নিয়ে চর্ম বাদ্যে তুলতেন মিষ্টি সুর। সিন্থেটিক বাদ্যে যে স্বাদ পূরণ হবার নয়। মাত্র কয়েকটি যন্ত্রপাতি নিয়ে শহরের বুকে হাঁক তুলতেন জুতো সারাই-পালিশ করার জন্য। আজ অবশ্য গ্রামেও জুতো চলার পথে সবার সঙ্গী। জন্তুর শক্ত ক্ষুর আছে কিন্তু মানুষের তা নেই; জুতোই হলো তার বিকল্প।

উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি বিদ্যা নিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলি ও রপ্তানি শিল্পে চামড়ার গুরুত্ব বুঝেছে। তৈরি হয়েছে বিপণন ব্যবস্থা। পাশাপাশি দক্ষ শ্রমিকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বেঁচে রইল কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ধারাটিও। এ ধারাটিকে বাঁচাতে ১৯৭৯ সালে আধুনিক যন্ত্রপাতির সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তৈরি হয়েছিল কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার। তপসিয়া, শ্যামবাজার এবং কলকাতার বাইরে বীরভূমের শান্তিনিকেতন বাণিজ্য জগতে চর্মশিল্পকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ব্লক বা ভাইসের সাহায্য নিয়ে নকশি চামড়ার কাজে আকর্ষণ বেড়েছে। চামড়া শুদ্ধি করা এবং চামড়া মসৃণ করা ও রঙিন করার কাজ দক্ষতার সঙ্গেই করে চলেছেন চর্মশিল্পের কারিগররা। চর্মশিল্পের শীর্ষভাগ যন্ত্র ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছে। হস্তশিল্পের ধারাটি নিত্যনতুন বৈচিত্র্যের সন্ধানে। গণ্ডারের চামড়ায় তৈরি ঢাল তার প্রয়োজন হারিয়েছে কিন্তু চামড়া তার নিজস্ব সৌন্দর্য নিয়ে তার আকর্ষণে বৈচিত্র্য এনেছে। বসার জন্য মোড়ার বেড়ি থেকে সোফাসেট সবই হচ্ছে চামড়া দিয়ে। ঘড়ির বেল্ট থেকে চশমার খাপ ওই সবই। আর এতে নক্‌শি কাজ আলাদা মাত্রা দেয়। কিন্তু হারিয়ে গেছে মাথামোটা পেতলের পেরেকে নানা নক্‌শা তোলা চামড়ায় জড়ানো কাঠের সিন্দুক কিংবা মুখে কাঠ গোঁজা চামড়ার তেলের কুপো। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER CO.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone: +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email: pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর



BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

প্রভাত পাকড়াশি ও খাই-খাই কার্ড



পার্থসারথি গুহ

এবার শীতটা যে বেশ জাঁকিয়ে পড়তে চলেছে তা বোঝা যাচ্ছে পুজোর পর থেকেই। লক্ষ্মীপুজোর পর ঘনীভূত হওয়া একটি নিম্নচাপ সরতেই ঠাণ্ডা আরও গতি পেতে আরম্ভ করেছে।

এমনই এক শীত জড়ানো সকালে ফ্ল্যাটের এক চিলতে বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বেশ আয়েশ করে চা খাচ্ছিল পার্থ। সাউথ ফেসিং দু'তলার এই ব্যালকনি থেকে পাড়ার সবচেয়ে জনপ্রিয়তম এলাকা মানে এই তল্লাটের কফিহাউস মানিকদার চায়ের দোকান প্রায় মুখোমুখি। রাস্তাটা পার করলেই সেই বিখ্যাত জায়গা। নতুন শীতের মৌতাতে বুঁদ হয়ে যাওয়া পার্থর সুখানুভূতিতে খানিকটা হলেও ভাটা পড়ল মানিকদার চায়ের দোকান থেকে ভেসে আসা কলতালে।

রবিবারের সকালে পাড়ার মোড় তখন রীতিমতো সরগরম। যথারীতি এবারেও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন এক এবং অদ্বিতীয়ম্ প্রভাত পাকড়াশি। যদিও নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের এখনও মঞ্চে পদার্পণ হয়নি। সেই মহারাজের আসার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে পাড়ার পাবলিক। যাকে বলে একেবারে হাপিত্যেশ করে বসে আছে তারা। আসলে প্রভাত পাকড়াশি নামটার জাদুই এমন। তিনি যা করেন তাই পুরো পাড়ায় খবর হয়ে ওঠে। তার মশাপুজোর নিদান দেওয়ার কথা এখনও এলাকাবাসীর মুখে মুখে ঘোরে। যাক সে কথা। এবার যে জিনিসটা প্রভাতবাবুর মাথায় ঢুকেছে তা ভূভারতে কেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই হয়তো কারও মাথায় আসেনি। তবে এই চিন্তাটা প্রভাতের উর্বর মস্তিষ্কে উগরে দেওয়ার ক্ষেত্রে পাড়ার ছেলে ছোকরাদের ভূমিকাও কোনও অংশে কম নয়। বলাবাহুল্য, এই চিন্তা একবার মাথায় ঢোকার পর থেকে প্রভাতবাবু যাকে বলে একেবারে খেপে উঠেছেন। প্রভাতবাবুকে করা পাড়ার যাবতীয় আবোলতাবোল চিন্তার শিরোমণি নকুলের এক ফোন কল থেকে এই জমজমাট নাটক পর্ব শুরু হয়েছে।

প্রভাতবাবুর বয়ানে তুলে ধরা সেই কথোপকথন ছিল খানিকটা এইরকম। হ্যালো, মিস্টার প্রভাত পাকড়াশি বলছেন? হ্যাঁ, বলুন। প্রভাত পাকড়াশি হিয়ার। বেশ কেতা করে প্রভাতবাবু উত্তর দেওয়ার পর উলটো দিক থেকে ফের প্রশ্ন, আপনি তো সিনিয়র সিটিজেন? জবাবের অপেক্ষা না করেই ফোনকর্তার আরও সংযোজন, শুনুন, মিস্টার পাকড়াশি কলকাতা পুরসভা থেকে বলছি। আপনার মতো বিদগ্ধ, শিক্ষিত ও বর্ষীয়ান কিছু মানুষকে আমরা বেছে নিয়েছি একটি বিশেষ কার্ডের জন্য। রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড বা আধার কার্ডের থেকে কোনও অংশে কম নয় পুরসভার এই খাই-খাই কার্ড। আপনি পুরসভার কোন ওয়ার্ডে থাকেন যেন? আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যাওয়া প্রভাত কোনওরকমে ঢোক গিলে বলেন, আজ্ঞে আমার নিবাস ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডে। তা এই খাই-খাই কার্ড পেলে আমার কী সুবিধা হবে? আর এর জন্য আমায় কত দক্ষিণাই বা গুনতে হবে? সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রান্ত থেকে জবাব আসে, মিস্টার পাকড়াশি আপনি হলেন গিয়ে শহরের মান্যিগণ্যি ব্যক্তি। আপনার থেকে কী কোনও টাকা পয়সা নেওয়া যায় নাকি। এই খাই-খাই কার্ড আপনাকে দিতে পেরে পুরসভাই ধন্য বোধ করছে। এই কার্ড ইস্যু হওয়ার পর থেকে আপনি এই ওয়ার্ডের অন্তর্গত পুরসভার হাতে থাকা নিমন্ত্রণ বাড়ি কেয়াতে যে কোনও অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন। খাওয়া দাওয়া তো করবেনই, উপরন্তু বেরিয়ে আসার সময় বাড়ির জন্য একটা প্যাকেটও দিয়ে দেওয়া হবে আপনাকে। শুধু কেয়া বলে নয় আপনি কলকাতা পুরসভার আওতায় থাকা যে

কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতেও এই খাই-খাই কার্ড দেখিয়ে যেতে পারবেন। তবে সেটা সপ্তাহে মাত্র দশদিন। এমনিতেই সারাদিন এটা ওটা খেয়ে দেয়ে বেড়ানোর জন্য (অবশ্য নিজের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে তিনি কিছু খান সেকথা তাঁর একান্ত প্রিয় মানুষও বলতে পারবে না) গোটা তল্লাটে বিখ্যাত প্রভাত পাকড়াশি এই খাই-খাই কার্ডের কথা শুনে তো যাকে বলে একেবারে নৃত্য শুরু করে দিয়েছেন। আর নকুলের করা এই ভুয়ো ফোনকে পাকড়াশিবাবু ধ্রুব সত্যি ধরে নিয়ে পাড়াময় ঢাক পিটিয়ে প্রচার করে ফেলেছেন।

নকুল তো পুরসভার নাম করে ফোন করেই খালাস। পেট পাতলা প্রভাতের দৌলতে সেই ফোন কলের গুলগপ্পো সবার কানেই পৌঁছেছে। তবুও কিছু না জানার ভান করে এবার প্রভাত বচন শুনতে মাঠে নামতে চলেছে পার্থ। আর কোন জাদুতে প্রভাত পাকড়াশি বশ হয় সেটা পার্থর থেকে বোধহয় খুব কম মানুষই জানে। সেই খ্যাটন মন্ত্রে প্রভাতবাবুকে বেঁধে রাখার অভিপ্রায়ে মানিকদার দোকানে এসে ডবল ডিমের ওমলেট আর গরমাগরম চা অর্ডার করল পার্থ। বলাবাহুল্য, প্রভাতদার জন্যও সেই একই খাবারের ফরমাইশ করা হলো। ডবল ডিমের ওমলেটের কথা শুনে তখন চক্ষু ছানাবড়া হয়ে উঠেছে পাকড়াশিবাবুর। পার্থর দিকে ফিরে তিনি শুরু করলেন, ভায়া আজ পর্যন্ত কী কী কার্ডের নাম শুনেছ বলো তো? ইতিমধ্যেই নকুলদের মুখে এরকম একটা ঘটনার আঁচ পেয়ে যাওয়ায় পার্থ তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, কেন দাদা কার্ড বলতে বিয়ের কার্ড, শ্রাদ্ধের কার্ড, আগেকার দিনের গ্রিটিংস কার্ড এগুলোই তো মাথায় আসে প্রথমে। প্রভাতবাবু সহাস্যে বলে ওঠেন, ভাবো ভাবো। আর কীসের কথা মনে পড়ছে। পার্থর উত্তর, হ্যাঁ ওই টি এন শেষণ সাহেবের পদার্পণ ঘটার পর ভোটার আই কার্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনে। অবশ্য আধার কার্ডকে নিয়েও যেভাবে খিল্লি চলছিল মনে হচ্ছিল জন্মানো থেকে মৃত্যু ইস্তক এই আধার আমাদের জীবনের রক্ষাকবচ। যদিও সেই কার্ডও তো এখন বিশ বাঁও জলে। পড়ে থাকার মধ্যে এখনো টিমটিম করে জ্বলছে সবেধন নীলমণি রেশন কার্ড। যদিও তার আয়ু নিয়েও সন্দেহ আছে। তাছাড়া কার্ড বলতে তো আর বুঝি গ্রিন কার্ড, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড এইসব। যদিও এসবের খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না আমার। পার্থর কথা শেষ হওয়ার মুখেই হাসিমুখে মানিকদা বেশ কড়া করে ভাজা দুটো ডবল ডিমের ওমলেট রেখে গেল প্রভাতবাবু আর পার্থর সামনে। ধূমায়িত চা ছিল এই টায়ের সঙ্গী। গোগ্রাসে সেই ওমলেট মুখে পুরে প্রভাত শুধোল, তা খাই-খাই কার্ডের কথা কি কখনও শুনেছ? পার্থ যথারীতি না জানার ভান করে দুপাশে মাথা হেলালো। যার জন্য এত সাধ্যসাধনা এবার আরম্ভ হলো সেই প্রভাত-নামা।

বুঝলে পার্থ তোমরা আমার কদর করো, আমার বিদ্যা-বুদ্ধির তারিফ করো এসব তো জানতামই। কিন্তু, খোদ কলকাতা কর্পোরেশনের নোটবুকেও যে এই অধমের নাম উঠেছে তা জানতে পারলাম গতকাল দুপুরে। তা কী এমন হলো যে কলকাতা কর্পোরেশন আপনাকে নিয়ে পড়ল? সেই খবরটা দেওয়ার জন্যই তো এতকথা বলছি ভায়া। তুমি তো জানোই আমিও তোমার মতো সমঝদার শ্রোতা খুঁজি সবসময়। আরে বাবা তুমি সব ব্যাপারস্যাপারগুলো বোঝো। তোমায় বলেও শান্তি পাই। বাকিদের কথা যত না বলা যায় ততই ভালো। চায়ে শেষ চুমুকটা দিয়ে তিনি এমনভাবে দোকানের ভিতর দিকে কাতর দৃষ্টি মেললেন তাতে বেশ বোঝা গেল বাকিটা শুনতে হলে মানিকদাকে স্পেশ্যাল কিছু পেশ করতে হবে। তাই আর কালবিলম্ব না করে হাঁক পাড়ল পার্থ, ''ও মানিকদা, প্রভাতদাকে একটা কেক আর দুকাপ চা দাও তো এদিকে''। চা-কেকের এই অর্ডার টনিকের কাজ করল প্রভাতের কাছে। সে তার ঝলমলে হয়ে ওঠা মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল। মওকা বুঝে পার্থও সুবোধ বালকের মতো জিজ্ঞেস করল, তা দাদা এই খাই-খাই কার্ডটা আবার কী? কেকে একটা জবরদস্ত কামড় বসিয়ে পাকড়াশিবাবু বলতে লাগলেন আরে গতকাল পর্যন্ত আমিই কি জানতাম নাকি এই কার্ডের কথা। তাও আবার পুরসভার কার্ড বলে কথা। এই খাই-খাই কার্ড কলকাতা পুরসভা ইস্যু করতে চলেছে আমার মতো সমাজের কিছু বিদগ্ধ মানুষের কথা ভেবে। তোমরা আমায় সম্মান আত্তি করো তা জানতাম, কিন্তু খোদ কর্পোরেশনও যে সমাজের একজন কেউকেটা হিসেবে আমাকে ভাবছে তার স্বীকৃতি হলো এই কার্ড। এই খাই-খাই কার্ড দেখিয়ে আমি এখন থেকে পুরসভার হাতে থাকা কেয়া বলে নিমন্ত্রণ বাড়িটায় যে কোনও অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে হাজির থাকতে পারব। শুধু তাই নয়, কলকাতা শহরে কর্পোরেশনের অন্যান্য নিমন্ত্রণ বাড়িতেও হাজির থাকতে পারব এই কার্ড দেখিয়ে। তবে নিজের ওয়ার্ডে যেখানে রোজ যাওয়ার সুযোগ থাকছে সেখানে ওয়ার্ডের বাইরের নিমন্ত্রণ বাড়িগুলোয় সপ্তাহে অন্তত ১০ দিন আমার প্রবেশাধিকার থাকবে। এই কথা বলে কেকে শেষ কামড়টা বসিয়ে আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিলেন প্রভাত পাকড়াশি। ঠিক এই সময়ই দোকান মালিক মানিকদা হঠাৎ বলে উঠল, কী মজা বলুন তো প্রভাতদা। আপনাকে তো বাড়িতে খেতেই হবে না। রোজ নেমতন্ন বাড়িতে কত মাছ, মাংস, পোলাও, বিরিয়ানি, মণ্ডা মিঠাই খাবেন। বাজারেও যেতে হবে না আর। সত্যি, বিশাল সুযোগ পেয়েছেন দাদা! এতো লটারি পাওয়ার মতো ব্যাপারস্যাপার। মানিকদার এই কটাক্ষ মাছি তাড়ানোর মতো পাশ কাটিয়ে প্রভাত বললেন, আরে মানিক, তুমি খালি খাওয়ার ব্যাপারটাই দেখলে। এর কত বড় সম্মান সেটা তোমার নজরে পড়ল না? পার্থ পরিবেশটা গরম হতে না দিয়ে মানিকদাকে চোখ টিপে স্বগতোক্তি করে উঠল, যাই বলো না গো, প্রভাতদা আমাদের গর্ব। থ্রি চিয়ার্স ফর প্রভাত পাকড়াশি, থ্রি চিয়ার্স ফর খাই-খাই কার্ড। মানিকদা পাশ থেকে চিল্লিয়ে উঠল, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে। ■

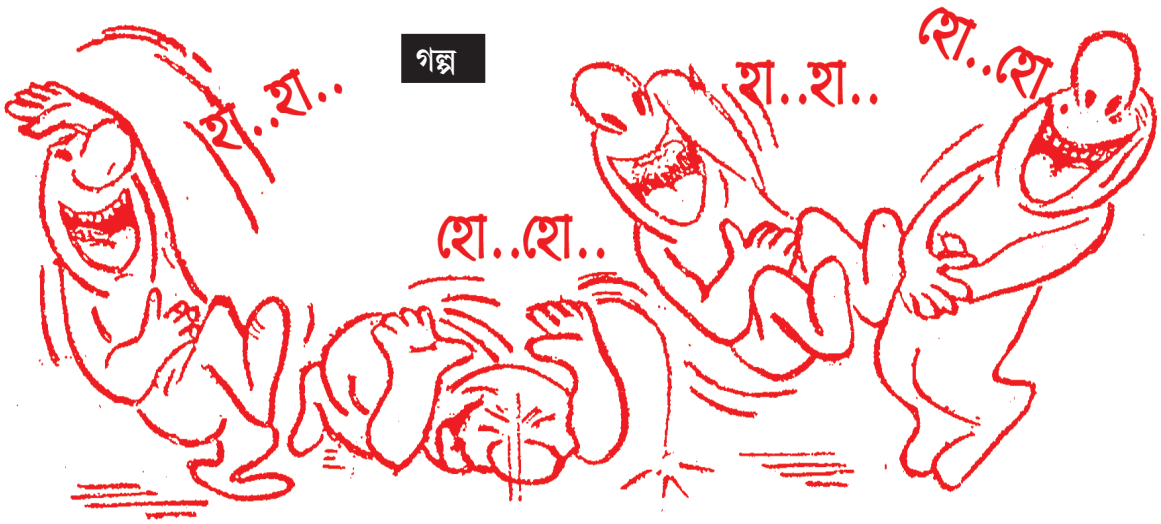

লাফিং ক্লাব

রঞ্জিতকুমার ভরদ্বাজ

'বার্ধক্যে বারাণসী' আপ্তবাক্যটি একালে কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে মতভেদ হতেই পারে। কথাটির অর্থ কি এই যে— বৃদ্ধ না হলে কাশীবাসী হওয়া চলবে না? অথবা, বৃদ্ধাবস্থায় অন্যত্র নয়, গন্তব্য একমাত্র বরুণা এবং অসি নদীবেষ্টিত এই পৌরাণিক শহর? এসকল বিষয় ইদানীং ভাবায় প্রফেসর অখিলবন্ধু চট্টরাজকে। ইংরেজির এই অধ্যাপকের ধর্মকর্মে বিশেষ মন কোনওদিন ছিল না। তাই কেউ যখন বলে— রিটায়ার করে কী করবে ভাবছ বা, কথায় বলে যে বয়সে যা, বার্ধক্যে বারাণসী; এবার ভালো গুরু দেখে দীক্ষাটা নিয়ে ফেল...তখন স্মিত হাসিতে জবাব সারেন, চট করে চটেন না।

মহানগরীর উপকণ্ঠে ফ্ল্যাটে এসে আজকাল এ বি সি যেন নীড় ছাড়া মীন। পরিচিতিহীন নির্বান্ধব অখিলবন্ধু ছুতোয় নাতায় ঘুরে আসেন পথে, পার্কে, বাজারে। স্ত্রী একদিন বলেই ফেলল— রিটায়ার করেছ, বুড়ো মানুষ ঘন ঘন রাস্তায় ঘাটে, ভিড়ভাট্টায় যাবার দরকারটা কী, ঘরে বসে আরাম করো, টিভি দেখ। 'বুড়ো' শব্দটা ছাঁৎ করে আঁতে লাগে, ডেরোগেটরি ওয়ার্ড। চাকরি নেই বলে স্ত্রীর এলাকায় কুঁকড়ে থাকবেন? কভি নেহি। আগে যে খুব বহির্মুখী, মিশুকে, আমুদে ছিলেন তা নয়। আর সজ্ঞানে না হোক পেশাসূত্রে এ যাবৎ নৈর্ব্যক্তিকতার একটা মুখোশ চেপে বসেছিল। সেটা সরিয়ে এখন চোখে মুখে খোলা বাতাস লাগাবার ইচ্ছা হয়। এ যাবৎ ছোটো শহরে ছিল কিছু সামাজিকতা, রিক্রিয়েশন, এখন তার অভাবও পীড়া দেয়। উপলব্ধি করেছেন লাইফস্টাইল বদলের গুরুত্ব। একটা মনোভাব তাঁর মধ্যে সক্রিয় ছিল বরাবর যে— ইয়ং এজে বয়স্কদের মতো ধীর স্থির হও আর বয়সকালে করো তারুণ্যের সাধনা। যুবকের প্রগলভতা দমিয়ে হঠকারিতামুক্ত স্বাতন্ত্র্য আর প্রবীণের জড়তা, ঔদাস্য দূরে ঠেকিয়ে বিবিধ চর্চায় জীবন হয় সহজ, সাবলীল। স্ত্রীকে বোঝালেন— এখনই তো হাঁটাচলা করা জরুরি, নইলে নানা রোগ বাসা বাঁধবে শরীরে। বাস্তবিক, এ ব্যাপারটা ইদানীং তাঁকে ভাবায়, হেলথ ইনস্যুরেন্সের ভরসায় নিশ্চিন্তে ঘুমানো কাজের কথা নয়, একটু স্বাস্থ্য-চর্চাও দরকার। তাই পূর্ণোদ্যমে চলে তাঁর হাঁটাহাঁটি, সকালে, বিকেলে। আশপাশের নতুন নতুন এলাকা চেনাও হয়ে যায়। এমন করেই একদিন চোখে পড়ল এক লাফিং ক্লাবের সাইন বোর্ড। সুস্থ জীবনের জন্য হাসির গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে সেখানে— হাসি নাকি টনসিল, হাইড্রোসিল, পেটখারাপ, মাথাখারাপ, ব্লাডপ্রেসার, সুগার, প্যানিক্...প্রায় সর্বরোগহর।

দুদিন পর। বার্ষিক চাঁদার রসিদটা হাতে ধরিয়ে ভারিক্কি চালে যুবক ইনচার্জ সামনে চেয়ারে বসা চট্টরাজকে বুঝিয়ে দেয় ক্লাবের নিয়ম। স্কাই-ব্লু রঙের ট্রাক স্যুট পরে আসতে হয় কাছের মাঠে, সামান্য ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়ামের পর ছোটো ছোটো সারিতে একসঙ্গে চলে হাসির মহড়া। এছাড়াও ক্লাবে কিছু খবর-কাগজ- ম্যাগাজিন, আনন্দ-করার ব্যবস্থা আছে, বছরে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে সপরিবার গেট টুগেদারও হয়। ক্লাবঘর দুটো ঘুরে দেখে বিশেষ মন ভরল না স্যারের। শিবরাম চক্কোত্তি, মুজতবা আলি, সঞ্জীব চাটুজ্জে, খুশবন্ত সিংহ...কিছুই নেই...। পরদিন ক্লাবে গিয়ে বসতেই কালকের লোকটি শুরু করল বক্তৃতা, যেন ছাত্র পড়াচ্ছে।

জীবের মধ্যে কেবল মানুষই হাসতে পারে। বানর, শিম্পাঞ্জি এরকম দু'একটি প্রাণীর কৌতুক-লক্ষণ কিছু দেখা গেলেও তা ঠিক হাসি নয়। আধুনিক যুগে স্ট্রেস ও দুর্ভাবনায় আমরা হারাচ্ছি এই দুর্লভ ক্ষমতা। শরীরে দেখা দিচ্ছে নানা রোগ। হাসির সঙ্গে প্রাণবায়ুর সম্পর্ক এবং তা নিয়ন্ত্রণে কীভাবে লাভবান হতে পারি সেসব বলার পর সে জানাল আসল কথাটা। হাসি, শুধু হাসিই পারে হরেক রোগ প্রতিরোধ করতে। কিন্তু এ হাসি মজার, কমিকের হাসি নয়, এটা অতি উত্তম এক ব্যায়াম। কোনও উৎকট ঘটনা দেখে বা কথা শুনে স্বতঃস্ফূর্ত হাসি ভালো কিন্তু তার তো নিশ্চয়তা নেই, কখন কী মাত্রায় ঘটবে। মজা করা, কাউকে আনন্দদান নয়, এই হাসির উদ্দেশ্য নিজের সর্বাঙ্গীণ লাভ। এরপর শুরু হলো তার প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন, সঙ্গে প্রফেসরের পরীক্ষা। ব্যাপারটা যে এমন শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে অখিলবন্ধুর আন্দাজ ছিল না। দীর্ঘদিনের জড়তায় সশব্দে প্রাণ খুলে হাসতে চেষ্টা করলেও ছোকরার বিরূপ মন্তব্যে মেজাজ ক্রমশ চড়ছিল। বছর পঞ্চাশ আগে রেডিওয় 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর'-এ পঙ্কজ মল্লিকের মতো 'হলো না, আবার ধরুন' বলে সে এক্সপার্ট-এর ভঙ্গিতে দেখায় আর এ বি সি-র পারফরমেন্স নাকচ করে। মানুষ কেন হাসে, আর হাসির রকমফের পান, হিউমার, স্যাটায়ার— এসব শেখাতে পারেন যিনি আজ ঘটনাক্রমে এক অর্বাচীনের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য তিনি কত সহ্য করবেন? ট্রেনার যুবা— 'নাঃ, আপনার দ্বারা সহজে হবে না দেখছি' বলামাত্র চট্টরাজ প্রবল ক্রোধে চেঁচাতে চাইলেন— 'হোল্ড ইয়োর টাং' কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্বভাবাশ্রিত সংযমে হোঃ হোঃ হোঃ শব্দে দম ছাড়লেন। প্রশিক্ষক লোকটি উল্লাসে হাততালি দিয়ে বলে উঠল--- এই তো, দাদা, সাক্সেসফুল...ফাইন।

প্রফেসরের রাগ মুহূর্তে গলে গেল, অনুভব করলেন ক্রোধ আর অক্রোধ একান্ত বিরুদ্ধ অভিমুখী হলেও সম্পর্কিত, হোক না কৃত্রিম, হাসি দিয়েই তো সংবরণ করা গেল মেজাজ। লাফিং ক্লাবই এখন হলো তাঁর স্বস্তির জায়গা। এটিই হোক তাঁর নিত্যকার বারাণসী। ■

প্রার্থনা

প্রার্থনা বা স্তুতি কেলমাত্র কতকগুলি শব্দের সমষ্টিমাত্র নয়। প্রার্থনা হলো ঈশ্বরে বা সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আপন অন্তরের সশ্রদ্ধ অনুভূতি জ্ঞাপন। প্রার্থনার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সাক্ষাৎ হয় সূক্ষ্ম ভাবে। ইথার তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে কারোর আকুল প্রার্থনা উপযুক্ত স্থানে পৌঁছে যায়। কাজেই ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি মনের কথা প্রার্থনার সময়ই হয়ে থাকে।



মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনার শক্তিতে দারুণভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন, প্রার্থনা না করলে আমি বহুদিন আগেই এত সমস্যা নিয়ে পাগল হয়ে যেতাম।

প্রার্থনা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো ব্যক্তির মধ্যে আলো ও শক্তি বিচ্ছুরণ করে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেন, যেখানে ওষুধে কাজ হয় না সেখানে প্রার্থনার দ্বারা অভাবিত ফল লাভ হতে দেখা যায়। রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্রার্থনার যে অফুরন্ত শক্তি রয়েছে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে নোবেলজয়ী ডাক্তার অ্যালেক্সি বলেছেন, প্রার্থনা হলো এমন একটি শক্তি যা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা যায়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতাই এটি সত্য। তাঁর কথায়, একজন চিকিৎসক হিসেবে যেখানে কোনও চিকিৎসাই ফলপ্রসূ হয়নি সেখানে প্রার্থনার নিশ্চল প্রয়াস রোগমুক্তি ঘটিয়ে বেদনার লাঘব করেছে।

প্রার্থনা স্বয়ংপ্রভ রেডিয়ামের মতো স্বতঃ উদ্ভাবন শক্তি তথা আলোকের উৎস। যখন আমরা প্রার্থনা জানাই তখন মহাবিশ্বের আবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে অফুরন্ত শক্তি আছে তার সঙ্গে আমাদের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তখন চাওয়া মাত্রই আমরা আমাদের ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি সংশোধন করার শক্তি অর্জন করতে পারি। আমরা যখন ভগবানর কাছে প্রার্থনা জানাই তখন আমাদের দেহ ও মন উন্নত স্তরে উত্তরণের জন্য পরিবর্তিত হয়। বলা হয়, সমবেত প্রার্থনার শক্তিতে বহু মানুষ মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন। কেউ কেউ কঠিন রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, ঈশ্বর সকলের প্রার্থনা শোনেন। তিনি বলতেন, 'ভগবান পিঁপড়ের পায়ের শব্দও শুনতে পান। তাহলে তিনি কি তোমার প্রার্থনা শুনবেন না? যখন তোমার ব্যাকুলতা যথার্থ হবে তখন তিনি নিশ্চয়ই তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন।' বিশ্বাস রেখে প্রার্থনা চালিয়ে গেলে নানা বাধাবিপত্তির পর সফলতা এসে যায়। প্রার্থনা মনকে নির্মল করে, চিত্তবৃত্তিকে শান্ত, সংযম ও আদর্শবান করে গড়ে তোলে।

মনে রাখত হবে, যে রকম সংস্কারে মনকে তৈরি করব আমরা, তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে। মনের মধ্যে যদি সর্বদা কুৎসিত ও খারাপ ভাব তৈরি করে বসে থাকি তাহলে ভগবান আমারে প্রার্থনা সহজে শুনবেন না। তাই পূর্বকৃত অপরাধের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে অনুতাপ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে আর আমার দ্বারা অপরাধ না হয় তারজন্য প্রার্থনা করতে হবে। করুণাময় ভগবানের কাছে নম্রভাবে যেকোনও ভাষায় প্রার্থনা করলেই তিনি শুনবেন। ঈশ্বর গোপনে থেকে আমাদের প্রার্থনা শুনবেন এবং ঠিক সময়ে তার ফল আমরা লাভ করতে পারব। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় পড়তে বসার আগে ভগবানের কাছে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করে আমাদের পড়তে বসা উচিত।

আমাদের সকলের প্রার্থনা হওয়া উচিত— জগতে শন্তি বিরাজ করুক। সকলে যেন বিপদমুক্ত হয়। সকলের মধ্যে যেন শুভবুদ্ধির উদয় হয়। সকলে যেন মহৎ চিন্তার মাধ্যমে কর্মপ্রেরণা লাভ করে। সকলেই যেন সুখী হয়। কেউ যেন দুঃখ ভোগ না করে।

বিশ্বজিৎ সাহা

ভারতের পথে পথে

মহীশূর



কর্ণাটক রজ্যের মহীশূরেই ছিল এককালে দানবরাজ মহিষাসুরের রাজ্যপাট। তখন নাম ছিল মহিষ্মতী বা মহিষাসুরপুরা। বিভিন্ন রাজা মহারাজারা কাল কালে নিপুণ হাত সাজিয়ে তুলেছেন মহীশূরকে। বর্তমানে রাজা-মহারাজাদের রাজত্ব গেলেও তাঁদের বৈভব আজও মহিমান্বিত করে রেখেছে মহীশূরকে। ৫ টি রয়্যাল প্যালেস, ডজন খানেক ম্যানসন মহীশূরের অন্যতম আকর্ষণ। এখানকার বৃন্দাবন গার্ডেন ও দশেরা উৎসবের খ্যাতি বিশ্বময়। প্রতি বছর দশেরায় দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটরা ভিড় করেন এখানে। এখানকার চামুণ্ডা মন্দির, মহীশূর রাজপ্রাসাদ, জগমোহন রাজপ্রাসাদ, ললিতা মহল, চামুণ্ডি পাহাড়, কৃষ্ণরাজ সাগরবাঁধ বিশেষ দর্শনীয় স্থান।

জানো কি?

- ধান মাড়াইয়ের মেসিনের নাম পাওয়ার থ্রেসার।
- জলের নীচে মাটি কাটার যন্ত্রের নাম ড্রেজার।
- ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো যন্ত্রের নাম ইনকিউবেটর।
- উদ্ভিদের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ।
- হৃৎপিণ্ডের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র কার্ডিয়োগ্রাফ।
- হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের শব্দ নিরূপক যন্ত্র স্টেথোস্কোপ
- মানব দেহের রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্র স্ফিগমোম্যানোমিটার।

ভালো কথা

বনসাই

সমুর ছোটোকাকুর বনসাই করার খুব বাতিক। বট,অশ্বত্থ গাছকে টবে বসিয়ে বামন করে রাখা অর্থাৎ বড়ো হতে না দেওয়ার নাম বনসাই। বর্ষার পরে কিংবা বসন্তের শুরুতে নতুন পাতা বেরুতে শুরু করলেই সমুর ছোটোকাকু কেটে ছেঁটে ন্যাড়া করে দিত। সমুর ঠাকুর্দা বলতেন বড়ো বড়ো গাছের বনসাই করতে নেই। ওতে পাপ হয়। সমুর কাকু ওসব কানেই তুলত না। দু'বছর আগে আর্মিতে চাকরি নিয়ে ছোটোকাকু দেরাদুন চলে যায়। সেদিনই ঠাকুর্দা বনসাইয়ের গাছদুটো কালীমন্দিরের মাঠে মাটিতে লাগিয়ে দেয়। দু'বছরে গাছদু'টো বেশ বড়ো হয়েছে। দেখে মনে হয় মুক্তির আনন্দে ওরা ভরপুর। সমুর ছোটোকাকু টবদু'টির কথা ভুলেই গিয়েছিল। পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসতেই সেদিন সমু ছোটোকাকুকে কালীমন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলল দেখো তোমার বনসাই। সমুর কাকু শুধু বলল আমি ওদের খুব কষ্টে রেখেছিলাম।

অমরেশ চক্রবর্তী, দশম শ্রেণী, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

শীতের মজা

দিশা দেবনাথ, একাদশ শ্রেণী, পতিরাম, দঃ দিনাজপুর।

টুপ টুপ পড়ে হিম
ঝুপ ঝুপ খসে পাতা,
শোঁ শোঁ হিমেল হাওয়া
শীত শীত শুধু পাওয়া।
কাশবন নেড়া শুধু
পদ্মেতে নেই মধু,
শিউলি মলিন মুখে
হাহাকার তার বুকে।

তারই মাঝে গুড়ি গুড়ি
এসে গেছে শীতবুড়ি,
এনেছে ঝাঁপি ভরি
কত কী যে নেই জুড়ি।
আরো আছে, মজা আছে
দূরে কিংবা ধারে কাছে
শীতের হিমেল হাওয়ায়
আনন্দ শুধু বেড়াতে যাওয়ায়।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ৩১





স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাস ভাবনা

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

স্বামীজী ছিলেন বহু প্রতিভাধর। তিনি ইতিহাস চর্চাও করেছেন, মতামত দিয়েছেন গ্রন্থতত্ত্ব বিষয়েও। তাঁর মতে ইতিহাস যা হয় লিখলেই সেটা সত্য হয় না। এককালে অনেক কথা কল্পনা থেকে লেখা হতো। কারণ পৃথিবী সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের দীনতা ছিল। তাই অনেক বিষয়ে সত্যাসত্য নির্ধারণে সন্দেহ জন্মায়। কোনও একটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার উপায় হিসাবে তিনি কয়েকটি সূত্র তুলে ধরেন। তিনি লিখছেন,

''১. মনে কর, একজন গ্রিক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, অমুক সময়ে ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত বলে একজন রাজা ছিলেন। যদি ভারতবর্ষের গ্রন্থেও ওই সময়ে ওই রাজার উল্লেখ দেখা যায়, তাহলে বিষয়টা অনেক প্রমাণ হলো বইকি। যদি চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলো টাকা পাওয়া যায় বা তাঁর সময়ের একটা বাড়ি পাওয়া যায়, যাতে তাঁর উল্লেখ আছে, তা হলে আর কোনও গোলই রইল না।

২. মনে কর, আবার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে একটা ঘটনা সিকন্দর বাদশার সময়ের, কিন্তু তার মধ্যে দু-এক জন রোমক বাদশার উল্লেখ রয়েছে। এমনভাবে রয়েছে যে প্রক্ষপ্তি হওয়া সম্ভব নয়— তা হলে সে পুস্তকটি সিকন্দর বাদশার সময়ের নয় বলে প্রমাণ হলো।

৩. তৃতীয় উপায় ভাষা। সময়ে সময়ে সকল ভাষারই পরিবর্তন হচ্ছে, আবার এক এক লেখকের এক একটা ঢঙ থাকে। যদি একটা পুস্তকে খামকা একটা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা লেখকের বিপরীত ঢঙে থাকে, তা হলেই সেটা প্রক্ষিপ্ত বলে সন্দেহ হবে।...

৪. তার উপর আধুনিক বিজ্ঞান দ্রুত পদসঞ্চারে নানা দিক হতে রশ্মি বিকিরণ করতে লাগলো; হল— যে পুস্তকে কোনও অলৌকিক ঘটনা লিখিত আছে, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য হয়ে পড়ল।

৫. মহাতরঙ্গরূপ সংস্কৃত ভাষার ইউরোপে প্রবেশ এবং ভারতবর্ষে, ইউফ্রেটিস নদীতটে ও মিসরদেশে প্রাচীন শিলালেখের পুনঃপঠন; আর ভূগর্ভে বা পর্বতপার্শ্বে লুক্কায়িত মন্দিরাদির আবিষ্ক্রিয়া ও তাহাদের যথার্থ ইতিহাসের জ্ঞান।

স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাস চেতনার বিশ্লেষণ করতে দেখা গেছে বিমান বিহারী মজুমদারকে। তিনি মত প্রকাশ করেছেন, অ্যারিস্টটলের মতো তিনি ঐতিহাসিক প্রণালীতে তথ্য সংগ্রহ করে তার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র বিষয়ক সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। স্বতঃ প্রামাণ্য বলে কিছু ধরে তা থেকে কোনও সিদ্ধান্ত টানা তাঁর রীতি ছিল না। তিনি সন্ধানী আলো ফেলে অতীতকে উন্মোচন, বর্তমানকে বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দিগদর্শন করেছেন।

স্বামীজীর বক্তব্য ছিল, আকর গ্রন্থ পড়তে হবে। এ প্রসঙ্গে নিজের এক অভিজ্ঞতার কথা তুলেছেন। তিনি মাসপেরো নামক এক ফরাসি পণ্ডিত তথা মিশর প্রত্নতাত্ত্বিকের মিশর ও ব্যাবিলনের ইতিহাস (Historie Ancien Oriental) পড়েছিলেন একজন ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিকের ইংরেজি তর্জমায়। পরে সে বিষয়ে আরও অনুধ্যান করতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গেলে, অধ্যক্ষ তাকে বললেন, তর্জমা পড়লে হবে না, মূল গ্রন্থ ফরাসি ভাষাতেই পড়তে হবে। কারণ অনুবাদক একজন গোঁড়া ক্রিশ্চান। খ্রিষ্টধর্মকে আঘাত করে এমন অংশ তিনি গোলমাল করে দিয়েছেন। স্বামীজী বুঝলেন ধর্মের গোঁড়ামি সত্যাসত্য তাল পাকিয়ে দেয়। তাই গবেষণা গ্রন্থের তর্জমার উপর তাঁর শ্রদ্ধা কমে যায়। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল, গবেষণাবিদ্যা বাইবেল, নিউ টেস্টামেন্টকে আলাদা রেখেছে। কারণ এককালের মারধোর, জ্যান্ত পোড়ানোর ভয় এখন না থাকলেও সমাজের ভয় কাজ করেছে।

সুন্দরবন প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' (ভারত : বর্তমান ও ভবিষ্যত) গ্রন্থে লিখেছেন, ''সোঁদরবন পূর্বে গ্রাম নগরময় ছিল, উচ্চ ছিল। অনেকে এখন ও কথা মানতে চায় না। এই সকল স্থানেই পোর্তুগিজ বম্বেটেদের আড্ডা হয়েছিল, আরাকানরাজের এই সকল স্থান অধিকারের বহু চেষ্টা, মোগল প্রতিনিধির গঞ্জালেজ প্রমুখ পোর্তুগিজ বম্বেটেদের শাসিত করবার নানা উদ্যোগ, বারংবার ক্রিশ্চান, মোগল, মগ, বাঙ্গালির যুদ্ধ।''

স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন (পরিব্রাজক— মনসুন : এডেন), ''এখন প্রত্যেক শক্তিমান জাতির যুদ্ধপোতনিচয় পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।...সুয়েজ খাল হচ্ছে এখন ইউরো -আশিয়ার সংযোগ স্থান। সেটা ফরাসিদের হাতে। কাজেই ইংরেজ এডেনে খুব চেপে বসেছে, আর অন্যান্য জাতও রেড-সীর ধারে ধারে এক একটা জায়গা করেছে। সাতশো বছরের পর পদদলিত ইতালি কত কষ্টে পায়ের উপর খাড়া হয়ে, হয়েই ভাবলে— কী হলুম রে! এখনি দিগ্বিজয় করতে হবে। ইউরোপের এক টুকরোও কারুর নেবার জো নাই; সকলে মিলে তাকে মারবে! এখন বাকি আছে দু-চার টুকরো আফ্রিকার। ইতালি সেই দিকে চলল। প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় চেষ্টা করলে। সেথায় ফ্রান্সের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এল। তারপর ইংরেজরা রেড-সীর ধারে একটা জমি দান করলে।'' ▮

তাজে জঙ্গি হানা, গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন ডিসিপি পাতিল

অন্য রকম



নিজস্ব প্রতিনিধি।। দশ বছর হয়ে গেল। তবু ২৬/১১-র কথা মনে পড়লে এখনও আমাদের বুক কেঁপে ওঠে। এদিন পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীরা মুম্বইয়ের তাজ হোটেলে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। ধূলিসাৎ করে দিতে চেয়েছিল এদেশের মানুষের আত্মবিশ্বাস। সমাজতাত্ত্বিকরা স্বীকার করন, মানুষের মনে একবার ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারলে জঙ্গি আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সুবিধা হয়। এই কারণেই জঙ্গিরা যে জায়গা দখল করে সেখানকার মানুষদের হত্যা করে তাদের আত্মবিশ্বাস ভেঙ্গে দেয়। এই ঘটনা কাশ্মীরে আকছার ঘটছে। মাওবাদী প্রভাবিত রাজ্যগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু মুম্বই স্পষ্টতই ব্যতিক্রম। তার কারণ তাজে জঙ্গি হানার খবর পাওয়ার পর মুম্বইয়ের কয়েকজন পুলিশ অফিসার যে সাহস দেখিয়েছিলেন, মানুষকে অনুপ্রাণিত করার পক্ষে তা যথেষ্ট।

এমনই এক অফিসার বিশ্বাস নাঙ্গরে পাতিল। সে রাতে তিনি প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায় এবং মান্ধাতার আমলের অস্ত্রশস্ত্র ও মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তখন পাতিল মুম্বইয়ের জোন ওয়ান ডেপুটি পুলিশ কমিশনার। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু ডিসিপি রাজ্যবর্ধন সিনহা, একজন সাব-ইন্সপেক্টর, হোটেলের দুজন সিকিউরিটি গার্ড এবং একজন সাংবাদিক। মজার ব্যাপার হলো, এই হামলার কয়েক মাস আগে মুম্বইয়েরই এক পুলিশ ফাঁড়িতে জঙ্গি হামলার প্রসঙ্গ চলছিল। পাতিল ও ডিসিপি রাজ্যবর্ধন সিনহা দুজনেই উপস্থিত ছিলেন সেই পুলিশ ফাঁড়িতে। মতামতও দিয়েছিলেন যে যার মতো। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি সত্যিই একদিন মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলা হবে এবং কম্যান্ডো আসার আগেই তাঁদেরই গিয়ে দাঁড়াতে হবে জঙ্গিদের সামনে।

যাই হোক, গাড়ি থেকে নেমে তাঁরা ঢুকে পড়লেন তাজের ভেতরে। মুম্বইয়ের তাজ হোটেল যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন রাজকীয় আভিজাত্যের চরম প্রকাশ ঘটেছে হোটেলের স্থাপত্যে, অঙ্গসজ্জায় এবং সার্ভিসে। এই হোটেলের সিঁড়িটি রয়্যাল স্টেয়ারকেস নামে পরিচিত । জঙ্গিরা আত্মগোপন করেছিল রয়্যাল স্টেয়ারকেসের আড়ালে। যার ফলে তাদের দেখা তো যাচ্ছিলই না, উপরন্তু ফাঁকফোঁকর দিয়ে গুলি চালাতে জঙ্গিদের সুবিধেই হচ্ছিল। ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাদের রিপোর্টে লিখেছিল, পাতিল প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায় ঈষৎ অনাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করে এক জঙ্গিকে খতম করতে সক্ষম হয়েছেন। দুর্দমনীয় সাহস না থাকলে এভাবে লড়াই করা যায় না।

কথাটা একশো শতাংশ সত্যি। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলি বিনিময় চলার সময় ডিসিপি পাতিল এবং তাঁর সঙ্গীরা সাহায্যের জন্য কন্ট্রোলরুমের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। আধঘণ্টা পর যোগাযোগ করা গেল। কিন্তু সেখানেও সমস্যা। কন্ট্রোলরুম বাড়তি ফোর্স কোথায় পাঠাবে? তাজের পুরনো বিল্ডিংয়ে, না নতুন বিল্ডিংয়ে। এই চাপানউতরে নষ্ট হলো বেশ কিছুটা সময়। ইতিমধ্যে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন সিসিটিভি-র অপারেশন রুমে। সেদিন ডিসিপি পাতিলের সঙ্গী সাব-ইনসপেক্টর নীতীন কাকড়ে বলেন, 'হঠাৎ শুনলাম দরজায় লাথি মারার শব্দ। বুঝলাম জঙ্গিরা দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে।' এর কিছুক্ষণ পরেই জঙ্গিরা বিস্ফোরণ ঘটায়। অপারেশন রুমের নকল সিঁড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে পুলিশ দলটির মাথার ওপর। ডিসিপি পাতিল এবং রাজ্যবর্ধন সিনহা অক্ষত থাকলেও সাব-ইনসপেক্টর নীতীন কাকড়ে গুরুতর আহত হন।

ডিসিপি পাতিল বলেন, 'পরের দিন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আমার স্ত্রী জানতো না আমি বেঁচে আছি না মারা গেছি। আমিও স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। তাজ হোটেলে জঙ্গি হানার খবর যখন পেলাম তখন মনে হলো আমাকে যেতেই হবে। জঙ্গিদের কোনওরকম সুযোগ দেওয়া চলবে না। তাই লড়াই যখন তুঙ্গে, তখন বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলে মনকে নরম করে ফেলতে চাইনি।'

কাম্যান্ডো বাহিনী এসে যাওয়ার পরেও ডিসিপি পাতিল লড়াই চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কন্ট্রোলরুম থেকে তাঁকে নিষেধ করা হয়। কারণ কম্যান্ডো আর পুলিশের কাজ করার পদ্ধতি আলাদা। বোঝাপড়ায় সমস্যা হতে পারে। ফলে ফিরে আসেন ডিসিপি পাতিল। পিছনে রেখে আসেন এমন এক দৃষ্টান্ত যা সমন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ভবিষ্যতের ভারত তাঁকে মনে রাখবে এক অসমসাহসী যোদ্ধা হিসেবে। এবং ভারতমাতার কৃতী সন্তান হিসেবেও। ■

বাংলাদেশে হাসিনার একনায়কত্বে অভিভাবকহীন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমাজ



রঞ্জন কুমার দে

শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনে ভোটের দামামা। অবশেষে মুজিব কন্যার তত্ত্বাবধানে নির্বাচনে যেতে বাধ্য হলো প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বি.এন.পি.)-সহ অন্যান্যরা। মূলত বাংলাদেশে ২০১৪-এর দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খালেদা জিয়ার বিএনপি-সহ শরিক দলগুলো তৎকালীন হাসিনা সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। বিএনপি-জামাত সমর্থকরা রাজপথে টানা হরতাল, আন্দোলন, পেট্রলবোমা-সহ অনেক সহিংস আন্দোলন করলেও হাসিনা কড়া হাতে তা দমন করেন। হাসিনাকে চাপে ফেলতে তখন বিরোধীরা সাধারণ নির্বাচন বয়কট করেছিল। কিন্তু এই ফর্মুলায় লাভের চেয়ে ক্ষতির অংশ বেশি হয়ে যায়, হাসিনা পেয়ে যান ওয়াকওভার। এই নির্বাচনটিতে মাত্র ২২ শতাংশ ভোট কাস্টিং হয়েছিল, তথাপিও প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে হাসিনার আওয়ামি লিগের সুসম্পর্ক থাকায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নির্বাচনটিকে বৈধতা পেতে তেমন বেগ পেতে হয়নি।

দেশটির প্রধান বিরোধী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টের অর্থ নয়-ছয় এবং চ্যারিটেবল মামলার অভিযোগে হাজত বাস করছেন। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা প্রায় কোমর ভাঙা, কোনও দলই দেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালীন ক্ষমতায় যাওয়ার অবস্থায় নেই। দেশে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন, তাই খালেদা জিয়ার 'ধানের শীষে' বেশ কয়েকটি সংকট কাজ করছিল। প্রথমতো হাসিনা সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনে যাওয়া মানে বিরোধীদের রাজনৈতিক পরাজয় স্বীকার করা, কেননা গত জাতীয় নির্বাচনে তারা একই কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। দ্বিতীয়ত, এমতাবস্থায় দলনেত্রী খালেদা জিয়াকে হাজতে রেখে নির্বাচন লড়া কীভাবে সম্ভব, এটাকে বিএনপি বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র ভাবছে। তৃতীয়ত, গত জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় বিরোধী শিবির এমনিতেই জনসংযোগহীন। তাই এইবার দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। তাই বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট হাসিনা সরকারকে নির্বাচনে যেতে একগুচ্ছ শর্ত বেঁধে দেয়। শর্তগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন এবং খালেদা জিয়াকে নিঃশর্ত মুক্তি। কিন্তু শেখ হাসিনা সকল প্রকার সংলাপ, শর্তগুলোকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। নির্বাচন কমিশন আগামী ২৩ ডিসেম্বর ১১তম সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে। নিরুপায় বিরোধী দল অবশেষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে, অন্ততপক্ষে শাসক দলকে ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার মোডে নেই বিরোধী শিবির।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি বিশ্লেষণ করলে শুধু একটা জিনিস পরিষ্কার 'হাসিনা রাজ'। খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত হয়ে দেশের বাইরে। বিএনপির অন্যতম জোট সঙ্গী জামাত ইসলামির রাজনৈতিক রেজিস্ট্রেশন রদ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে হাইকোর্ট দায়ের করা এক রিট পিটিশনের রায়ে আদালত



ফ: ৬

সংগঠনটিকে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেছিল। বাংলাদেশে বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি, ধর্মগুরু সবাই হাসিনার পাকেটে। প্রমাণস্বরূপ গত বছর সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত একটি মামলা ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগের পক্ষে রায় না দেওয়ায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এস.কে. সিনহাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। প্রথমে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় বিচারপতি ক্যান্সারে আক্রান্ত, তারপর দেশ ছাড়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে একগুচ্ছ মামলা দায়ের করা হয়। সম্প্রতি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সিনহার উন্মোচিত বই, 'A Broken Dream : Rule Of Law, Human Rights And Democracy' তে তিনি হাসিনা সরকারের হুমকি এবং ভীতির স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাসিনা বলছেন, ''Law will take it's own course.'' সংখ্যালঘু থেকে প্রথম নাকি সিনহাকে তিনি প্রধান বিচারপতি নিয়োগও তাঁর করুণায় করা হয়, আর তাঁর পক্ষে রায় না দিলে অপমান হয়ে যায়। হায় গণতন্ত্র!

বঙ্গবন্ধুর জমানা থেকেই আওয়ামি লিগকে হিন্দুদের আশ্রয়স্থল হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এরশাদ পরিচালিত সামরিক শাসনে বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা হয়। মজিবকন্যা শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগ সরকার কয়েক ধাপে সরকার গঠন করলেও সংবিধান পুনঃসংশোধনে তিনি কোনও সদিচ্ছা দেখাননি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী দেশে মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাস। নির্বাচনী আসনের ১৫ থেকে ৩৩ শতাংশ ভোট ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রয়েছে এমন আসনের সংখ্যা ৬০টি। আর ১০ থেকে ১৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট রয়েছে এরকম আসনের সংখ্যা ১২০টি। এই বৃহৎ সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের প্রায় ৯০ শতাংশ ভোট আওয়ামি লিগের ঝুলিতে পড়ে। কারণ কট্টর মৌলবাদী জমায়েত ইসলামি এবং বিএনপিকে সংখ্যালঘু সমাজ ভরসা করতে পারতো না। তাই বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জাতীয় নির্বাচনের আগে এবং পরে এই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হতো। তাহলে কি সেই আওয়ামি লিগ সরকারের অধীনে আজ সংখ্যালঘু সমাজ নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা আছে? এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশটিতে হাসিনা আমলেও ২০১৬ সালে সংখ্যালঘুদের উপর ১৪৭১টি হামলা হয়েছিল, ২০১৭ সালে ১০০৪টি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারকত সাহেবের গবেষণানুযায়ী প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬৩২ জন হিন্দু দেশ ত্যাগ করছে। অনুমান করা যাচ্ছে এভাবে চললে আগামী ২০ বছরে বাংলায় হিন্দু নামক জনসমাজ বইয়ের পাতায় ইতিহাস হয়ে রয়ে যাবে।

পূর্বেই বলেছি, নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট, রাষ্ট্রপতি সহ প্রত্যেকটি প্রশাসনিক বিভাগ এখন হাসিনার নিয়ন্ত্রণাধীন। বিএনপি নেতৃত্বহীন, জমায়েত ইসলামি নিষিদ্ধ, তাই সুযোগ সন্ধানী মৌলবাদীরা আওয়ামি লিগের নৌকায় ভিড় করছে। কিন্তু তার কুফল ভুগছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। রামু, নাসিরনগর-সহ দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে সংখ্যালঘু নিধনে এখন আওয়ামি লিগের নেতা কর্মীদের নাম উঠে আসছে। সংখ্যালঘুদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করানো হচ্ছে। জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ধর্ষণ, খুন, হুমকি লেগেই রয়েছে। আওয়ামি লিগের সমীকরণ সংখ্যালঘুদের উপর খুব সরল— 'দেশে থাকলে ভোট, দেশ ছাড়লে জমি।' হাসিনা সরকার শুরুতে ধর্মীয় মৌলবাদীদের চোখ রাঙানো উপেক্ষা করে ১৯৭১-এর যুদ্ধপরাধী রাজাকার, আলবদরদের ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে এক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। সময়ের পট পরিবর্তনে সেই কট্টর ইসলামপন্থী হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে হাসিনার মৈত্রী হয়েছে। কওমি মাদ্রাসা ভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম ২০১৩ সালে যুদ্ধপরাধীদের বিচারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তাণ্ডব নাচিয়েছিল এবং নারী শিক্ষার ঘোর বিরোধীও ছিল। এই পাঁচ বছরের ব্যবধানে হাসিনা কওমি মাদ্রাসাগুলোর দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স সমমানের স্বীকৃতি দিয়ে 'কওমি জননী'র সম্মান পেয়েছেন। হাসিনা সরকারের নতুন আরেকটি শাখার নাম 'ওলেমা লিগ'। মূলত অ-ইসলামিক প্রত্যেকটি কাজের বিরোধিতা এবং ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়িত করা তাদের লক্ষ্য। অন্যদিকে ভারতকে খুশি রাখতে দেশটির প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ে গ্রিণ কার্ড খেলছে। বিএনপি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ক্ষমতায় এলে তারা সংখ্যালঘুদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষণ রাখা ছাড়াও ধর্মীয় সংখ্যালঘু কল্যাণে পৃথক মন্ত্রণালয় গড়ে তুলবে। আওয়ামি লিগ কয়েক ধাপ এগিয়ে শীঘ্রই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিল করে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিচ্ছে। কিন্তু হাসিনার ওলামা লিগ আবার রাজপথে। এবার দাবি হিন্দু এমপির মনোয়ন দেওয়া হলে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হবে। কিন্তু শেখ হাসিনা ঠুটো জগন্নাথের ভূমিকায়। তাঁর এক হাতে সফট্ হিন্দুত্বকার্ড, অন্য হাতে ধর্মান্ধ উগ্রবাদী মুসলিম।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের দরুন হাসিনা রাজনীতিতে অতিরিক্ত মাইলেজ পাচ্ছেন। বিএনপি জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানপন্থী এবং ইসলামিক জঙ্গিবাদের ঘনিষ্ঠ। অতীতে বিএনপি দু' দফায় ক্ষমতায় এসেছিল— ১৯৯১-৯৬ এবং ২০০০-২০০৬। সেই সময় বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ শেকড় গেড়েছিল এবং ভারত বিরোধী শক্তিগুলি অক্সিজেনের ভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছিল। অন্যদিকে চীনও বাংলাদেশকে পাখির চোখ করেছে। ২০০৭ সালের পর থেকে চীন বাংলাদেশে প্রায় তিনশো কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। অন্যান্য দিক ছাড়াও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র জোগানদাতা দেশ চীন।

এমতাবস্থায় পাকিস্তান চীনকে ব্যাকফুটে রাখতে হাসিনা সরকারই দিল্লির বিকল্প ভরসা। কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা হাসিনার সঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদীদের ঘনিষ্ঠতায়। তাই তারাও আর কোনও বিশেষ দলের ভোটব্যাঙ্ক থাকতে আর রাজি নয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের একগুচ্ছ দাবি এবং সুরক্ষায় যে রাজনৈতিক দল বদ্ধপরিকর হবে ভোটবাক্স শুধু তাদের হয়েই কথা বলবে, আপাতত পরিস্থিতি তাই বলছে। ■

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা প্রজ্ঞা প্রবাহের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সংম্পাদক অরবিন্দ দাশের অগ্রজ অশোক কুমার দাশ গত ২ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ৫ ভাই ও ১ বোন রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের উত্তর দমদম নগর সঙ্ঘচালক ড. জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৪ নভেম্বর পরলোকগমন করেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গঙ্গাসাগর জেলার পূর্বতন সঙ্ঘচালক বিমান চৌধুরী গত ৫ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর স্মরণে গত ১৮ নভেম্বর স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়, তাতে উপস্থিত ছিলন দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী।

* * *

শ্রীবড়বাজার পুস্তকালয় সমিতির প্রবীণ সদস্য, রাজস্থান পরিষদের সংগঠন মন্ত্রী, লাম্ডনু নাগরিক পরিষদ ও অসোয়াল নব যুবক সমিতির ট্রাস্টি এবং কলকাতার বিভিন্ন সামাজিক- সাংস্কৃতিক-শৈক্ষিক সংস্থার জনপ্রিয় সমাজসেবী রুগলাল সুরানা জৈন গত ১৪ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। তিনি বেশ কয়েক মাস কর্কট রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শার্দুল সিংহ জৈন, ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী, অরুণপ্রকাশ মল্লাবত প্রমুখ।

* * *

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাঁকুড়া জেলার কোষাধ্যক্ষ হরসুন্দর দত্তের পিতা মন্মথ দত্ত গত ৮ নভেম্বর বাঁকুড়া শহরের গোপীনাথপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হযেছিল ৮৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি হিন্দু মহাসভার একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও রাখহরি চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

* * *

পুরুলিয়া জেলার লুধুড়কা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন কার্যকর্তা মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়(ফকিরবাবু) গত ২২ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী সহ পরিজনদের রেখে গেছেন। তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ কর্কটরোগে আক্রান্ত ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার চাঁচোল নগরের সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী বিশিষ্ট পরিবহণ ব্যবসায়ী সুধীর কুমার চক্রবর্তী গত ৯ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। তিনি ২ পুত্র, তিন কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গছেন। উল্লেখ্য, চাঁচোল বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের ভবন নির্মাণে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

* * *

হাওড়া জেলার খালোড় খণ্ডের স্বয়ংসেবক ও শঙ্খনাদ প্রমুখ রাজকুমার ভুঞ্যার পিতা শিবনাথ ভুঞ্যা গত ১৩ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৪ পুত্র, তিন কন্যা ও নতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মঙ্গলনিধি

সম্প্রতি বারাসাত নগরের সুশ্রুত শাখার স্বয়ংসেবক ডাঃ আশিস মজুমদার তাঁর নাতনি সম্প্রীতির 'মুখে ভাত' উপলক্ষ্যে মঙ্গলনিধি প্রদান করন বিভাগ প্রচারক মানিক চন্দ্র পালের হাতে। শ্রীপাল তা উত্তর ২৪ পরগনা বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টকে অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ১৪ অক্টোবর মালদহ জেলার পুরাতন মালদা নগরের স্বয়ংসেবক তথা বাচামারী বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের আচার্য স্বাধীন সাহার পুত্র শিবাজী সাহার শুভ জন্মদিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন স্বাধীন সাহার বাবা বীরেন্দ্রনাথ সাহা। অনুষ্ঠানে বিশেষভাব উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ সুব্রত মণ্ডল ও সহ প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক তথা বিজেপির বাঁকুড়া জেলার সাধারণ সম্পাদক সৌগত পাত্রের কন্যা অদ্রিজার 'মুখে ভাত' উপলক্ষ্যে তাঁর বাবা তুহিনাংশু পাত্র ও মা শ্রীমতী শুভ্রা পাত্র মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

সিউড়ী নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুনীল বিষ্ণু তাঁর মধ্যম পুত্র তীর্থঙ্কর বিষ্ণুর পুত্র শীর্ষজ্যোতি বিষ্ণুর পঞ্চমবর্ষ জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দুর্গাপুরে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন আসানসোল জেলা সম্পর্ক প্রমুখ জয়দেব বিশ্বাসের হাতে। অনুষ্ঠানে প্রান্ত সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায়-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধানিধি

দক্ষিণ কলকাতার প্রণবানন্দ নগরের স্বয়ংসেবক ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধের দিন শ্রদ্ধানিধি অর্পণ করেন সমাজ সেবা ভারতীর কার্যকর্তা সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের হাতে।

নানেরা নিরাপদ নয়

নিরাপত্তা আরও জোরালো করতে পুলিশের কাছে আর্জি চার্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেরলে নান ধর্ষণকাণ্ডের তদন্ত নতুন বাঁক নিয়েছে। সম্প্রতি কুরুভিলাঙ্গাদ কনভেন্টের মাদার সুপেরিওর জেনারেল সিস্টার রেজিনা পুলিশকে লেখা একটি চিঠিতে ধর্ষণকাণ্ডের সাক্ষী এবং অভিযোগকারিণী নানেদের নিরাপত্তা আরও জোরালো



করার আর্জি জানিয়েছেন। সিস্টার রেজিনার মতে সবদিক থেকে নিরাপদ কোনও সরকারি আবাসই হতে পারে অভিযোগকারিণী নানেদের সঠিক আশ্রয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে চলতি বছরের ২৭ অক্টোবর, কুরুভিলাঙ্গাদের সাব-ইন্সপেক্টর সিস্টার রেজিনাকে লেখা এক চিঠিতে নানেদের নিরাপত্তা জোরদার করার পরামর্শ দেন। তিনি লেখেন, 'নান-ধর্ষণের প্রধান সাক্ষী ফাদার কুরিয়াকোজ খুন হওয়ায় দেশজুড়ে বিতর্কের আবহ তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় যেসব সাক্ষী জীবিত রয়েছেন তাদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা দরকার।' কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তাও তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেন। তাতে, কনভেন্টের প্রবেশ এবং নির্গমন পথে সিসিটিভি, রাস্তা থেকে কনভেন্ট পর্যন্ত এবং ছাদে ও বারান্দায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছিল। এছাড়াও ওই সাব-ইন্সপেক্টর ধর্ষণকাণ্ডের জীবিত সাক্ষী ছ'জন নানের জন্য আলাদা রান্নার লোক (বিষপ্রয়োগে হত্যা আটকাতে) এবং বিপদ বুঝলে সময় মতো পালাবার জন্য বেরোবার দরজার একটা করে অতিরিক্ত চাবি তাদের দেবার কথা বলেছিলেন। সাব- ইন্সপেক্টরের সেই চিঠিরই জবাব দিয়েছেন মাদার সুপেরিওর জেনারেল। তিনি লিখেছেন, 'কনভেন্টের প্রতিটি নান এবং অন্য বাসিন্দাদের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু আপনি যেসব ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা আমাদের নেই। তাছাড়া, আপনার সুপারিশ করা কয়েকটি ব্যবস্থায় কনভেন্টের দৈনন্দিন কাজকর্মে অন্তরায় ঘটবে বলেও আমরা মনে করি। সেই জন্য বলছি, আপনি যদি মনে করেন ধর্ষণকাণ্ডের জীবিত সাক্ষী নানেরা এখানে নিরাপদ নন তাহলে সব দিক থেকে নিরাপদ কোনও সরকারি আবাসে স্থানান্তরিত করাই সমীচীন হবে।'

আন্দামানে ইউ এস নাগরিক হত্যাকাণ্ডে নতুন মোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আন্দামান ও নিকোবরের উত্তর সেন্টিলেন দ্বীপে আমেরিকার নাগরিক জন অ্যালেন চাউয়ের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। অভিযোগ, চাউ ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যে উত্তর সেন্টিনেল দ্বীপে গিয়েছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চাউ যে ওই দ্বীপে যাবেন সেকথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাননি। দ্বীপে বসবাসকারী জনজাতিরা বহিরাগতদের পছন্দ করে না। জোর করে কেউ তাদের এলাকায় প্রবেশ করলে তারা হিংস্র হয়ে ওঠে। পুলিশ যোলোজন ধীবরকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, তারা চাউকে সেন্টিনেল দ্বীপে যেতে সাহায্য করেছিল। পুলিশি জেরায় ধীবররা জানিয়েছেন, জনজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা তির ছুঁড়ে চাউকে হত্যা করে। তারপর তার মৃতদেহ দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায় এবং সমুদ্রের তীরে পুঁতে দেয়। চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটতে দেখে তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাই পালিয়ে যায়। ধীবররা আরও জানিয়েছে, চাউ ওখানে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। প্রত্যক্ষ না হলেও, ধীবরদের কথার পরোক্ষ সমর্থন মিলেছে চাউয়ের পরিবারের ইনস্টাগ্রাম-বার্তায়। পরিবারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, 'অন্য সকলের কাছে চাউ ছিল খ্রিস্টান মিশনারি, ফুটবলের কোচ এবং পর্বতারোহী। চাউ ঈশ্বরকে ভালোবাসত। ঈশ্বরের ভালোবাসার সন্ধান যারা এখনও পায়নি, চেষ্টা করত তাদের কাছে ঈশ্বরকে পৌঁছে দিতে। কিন্তু সেন্টিনেলে সে এইসব করতে যায়নি। গিয়েছিল শুধু ভালোবাসা নিয়ে।' প্রশ্ন উঠেছে, ভালোবাসার জন্যেই যদি যাওয়া তাহলে তো পুলিশকে জানিয়েও যাওয়া যেতে পারত। সুনামির সময়ও যে দ্বীপে ত্রাণের হেলিকপ্টার নামতে পারেনি, ঝাঁকে ঝাঁকে তির এসে পথ রোধ করে দিয়েছিল— সেখানে চাউ শুধু ভালোবাসার জন্য গিয়েছিলেন, স্থানীয় মানুষ একথা মানতে নারাজ। তাদের অভিযোগ পুলিশ ঘটনাটিকে চাউয়ের 'ভুল' হিসেবে দেখাতে চাইছে। এটা তদন্তের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার একটা প্রয়াস বলে মনে করছেন তারা।

ভি এইচ পি-র হুংকার সভা ও ধর্ম সভা

অযোধ্যা-নাগপুরে একযোগে রামমন্দির নির্মাণের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'অযোধ্যায় এবার রামমন্দির নির্মাণের সময় হয়েছে', নাগপুরের বিদর্ভে গত ২৫ নভেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 'হুংকার সভা'য় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। সুপ্রিম কোর্ট রামমন্দির মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে কঠোর নিন্দা করে শ্রীভাগবত বলেন— 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে রামমন্দির মামলা সুপ্রিম কোর্টের অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই। হিন্দুরা সর্বদাই দেশের আইন মেনে চলেছেন এবং যথেষ্ট ধৈর্য দেখিয়েছেন। এক বছর আগেও আমি তাঁদের বলেছিলাম ধৈর্য রাখুন। কিন্তু এবার আমাদের ধৈর্যের সব সীমা অতিক্রম করেছে। তাই সফল আন্দোলনের পথে আমাদের যেতেই হবে।'



ওইদিনই অযোধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্ম সভায় আর এস এসের সহসরকার্যবাহ কৃষ্ণগোপালজী বলেন : 'আমাদের দেশের যুবসমাজ রামমন্দির নির্মাণের জন্য যতদূর যেতে হয় যাবেন। হিন্দুরা অযোধ্যা, কাশী, মথুরায় মন্দির চান।' কৃষ্ণগোপালজী আরও বলেন যে কারা অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে বাধা দিচ্ছে তা চিহ্নিত করতে হবে। সাধ্বী ঋতম্ভরাও এদিন তাঁর বক্তব্যে সুপ্রিম কোর্টকে তুলোধনা করে বলেন : 'আদালত মনে করেছে সমকামিতাকে তারা অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখবে, কিন্তু রামমন্দিরকে নয়। হিন্দুদের এতবড় অপমান আর হয়নি, এখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব রামলালাকে তাঁর জন্মস্থানে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা।'

একইদিনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রামমন্দির নির্মাণের জন্য একদিকে অযোধ্যা, অন্যদিকে নাগপুরে দু'দুটি বিশাল জনসভায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাতারে কাতারে যুবকেরা অংশ নেওয়ায় রামমন্দির তৈরি হতে না দেওয়া মহল রীতিমতো আতঙ্কিত। এই জোড়া ফলায় রীতিমতো বিদ্ধ কংগ্রেস আর রামমন্দির হতে না দেওয়া তাদের আইনজীবী মহল— কপিল সিব্বল, সলমন খুরশিদরা। সামনেই ৬ ডিসেম্বর, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শৌর্য দিবস। সেই কথা স্মরণ করিয়ে কৃষ্ণগোপাল বলেন : 'রামমন্দির রাজনীতির বিষয় নয়। অনেকেই মনে করেন ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের পর এই আন্দোলনের আর সার্থকতা নেই। কিন্তু সারা দেশের স্বাভিমান জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। শৌর্য দিবস পালনের মাধ্যমে এই কথাই আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।'

করসেবকপুরমের সমাবেশে রামজন্মভূমি ন্যাসের প্রধান নিত্যগোপাল দাস বলেন : 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। আমি মোদীজীকে রামমন্দির নির্মাণের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য অনুরোধ করি ও যোগীজী একাজে তাঁকে সহায়তা করুন।' ওইদিন বিভিন্ন সমাবেশে বক্তারা একসুরে প্রয়োজনে অধ্যাদেশ এনে রামমন্দির নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানান। অযোধ্যায় ন্যূনতম দেড় লক্ষাধিক রাম ভক্তের সমাগম হয়েছিল বলে সূত্রের খবর।

গ্যাস বণ্টন প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শহরে গ্যাস বণ্টন প্রকল্পের নবম পর্যায়ের শিলান্যাস করেছেন। নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবন থেকে তিনি শহরে গ্যাস বণ্টন ব্যবস্থার দশম নিলাম প্রক্রিয়ারও সূচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নবম পর্যায়ে, ১২৯টি জেলার শহর এলাকায় গ্যাস বণ্টন নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। দশম পর্বের নিলাম প্রক্রিয়ার শেষে ৪০০টি জেলা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে তিনি জানান। এর ফলে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ বর্তমানে গ্যাস ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে ঝুঁকছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই অর্থনীতির উন্নয়নে সব দিকে নজর দিচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। দেশের গ্যাস ক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার, এল এন জি টার্মিনালের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি গ্যাসের গ্রিড ও গ্যাসের বণ্টন ব্যবস্থা আরও কার্যকর করে তুলছে। পরিচ্ছন্ন শক্তি ক্ষেত্রে গ্যাস নির্ভর অর্থনীতির ভূমিকা বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিচ্ছন্ন শক্তি ক্ষেত্রের বিষয়ে সামগ্রিক সমাধানে সি জি ডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচ্ছন্ন শক্তি ক্ষেত্রের বিস্তার লাভের জন্য কাজ করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সরকার গৃহীত ইথানল ব্লেন্ডিং বায়ো গ্যাস কারখানার মতো বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন।

কর্তারপুর করিডোরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত এবং পাকিস্তানের পারস্পরিক শান্তি স্থাপনে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করল ভারত। সম্প্রতি উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু কর্তারপুর



করিডোরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে সন্ত্রাসদমন এবং দু'দেশের পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষায় ভারতের ইতিবাচক মানসিকতার পরিচয় দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ডেরা বাবা নানক থেকে কর্তারপুর সাহিব পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হবে। এই রাস্তা ভারত-পাক আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে শেষ হবে গুরুদাসপুরের মন গ্রামে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহ, কেন্দ্রীয় সড়কনির্মাণ মন্ত্রী নীতীন গড়করি এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী হরসিমরত কৌর বাদল। বেঙ্কাইয়া নাইডু তাঁর ভাষণে বলেন, 'শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষের অনেকদিনের স্বপ্ন আজ পূরণ হলো। এই করিডোর আমাদের গুরু নানকের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাবে।' এই প্রকল্পে পাকিস্তানের সহযোগিতামূলক মনোভাবের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান যে আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে, তার জন্য আমরা খুশি। এখন আর আমাদের আট্টরি হয়ে (কর্তারপুর) যেতে হবে না। এই করিডোর দু'দেশের মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করবে।' তিনি আরও বলেন, 'উন্নয়নের জন্য প্রথমেই দরকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রতিটি প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু লোক ধর্মের নামে আমাদের ধ্বংস করতে উদ্যত। এটা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। দু' দেশের সরকার সমান ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে কাজ না করলে এই ধ্বংসলীলা বন্ধ করা সম্ভব নয়।' কর্তারপুর করিডোর নির্মাণের কাজ শুরু করবে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া। প্রয়োজনীয় অর্থ দেবে ভারত সরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তানের রাভি নদীর ধারে কর্তারপুরে গুরুদ্বার দরবার সাহিব শিখদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিখ ধর্মগুরু গুরু নানক দেবজী তাঁর জীবনের শেষ আঠারো বছর (মৃত্যু ১৫৩৯) এখানেই ছিলেন। প্রতি বছর বহু তীর্থযাত্রী এখানে আসেন। কর্তারপুর করিডোর তৈরি হয়ে গেলে এই তীর্থযাত্রা আরও সুগম হবে।

মুম্বই হামলার মাথাদের ধরতে আমেরিকার পুরস্কার ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুম্বইয়ের তাজ হোটেলে জঙ্গি হামলার পর দশ বছর কেটে গেছে। কিন্তু মানুষের মন থেকে সেই ভয়াবহতা আজও মুছে যায়নি। সম্প্রতি আমেরিকা ঘোষণা করে বিশ্বের যে কোনও দেশের নাগরিক যদি মুম্বই হামলা-সংক্রান্ত এমন কোনও তথ্য দেন যা হামলায় জড়িত অথবা এই ষড়যন্ত্রের মাস্টারমাইন্ড কাউকে গ্রেপ্তার এবং শাস্তিদানের সহায়ক তাহলে তাকে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। সিঙ্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি মাইক পম্পেওর বৈঠকের পরেই এই ঘোষণা করা হয়। বৈঠকে দুই নেতাই ঐকমত্যে পৌঁছন যে মুম্বই হামলার পর দশ বছর কেটে গেলেও এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ডদের এখনও আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়নি।



প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ২৬ থেকে ২৯ নভেম্বর, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট লস্কর-ই-তৈবার ১০ জন জঙ্গি মুম্বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায়। ট্রাম্প প্রশাসনের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমেরিকা এবং তার আন্তর্জাতিক সহযোগীরা মুম্বই হামলায় জড়িত জঙ্গি এবং এই ষড়যন্ত্রের মাস্টারমাইন্ডদের বিচারব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার ব্যাপারে দায়বদ্ধ।'

আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিওয়ার্ডস ফর জাস্টিস প্রোগ্রামে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। বলা হয়েছে, কারোও কাছে কোনও তথ্য থাকলে তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে দেওয়া ইমেল এবং ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা চিঠি লিখতে পারেন রিওয়ার্ডস ফর জাস্টিসের ঠিকানায়। তথ্যদাতার নাম গোপন রাখা হবে।



বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরী

দিলীপ পাল

মহুয়া নামক এক সময়কার টলিউডের এক নম্বর অভিনেত্রী আবির্ভাব ঘটেছিল ১৯৭১ সালে। যখন পরিচালক তরুণ মজুমদার কিশোর রোমান্টিক ছায়াছবি তৈরি করেছিলেন 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' নামে কিশোরী টুটুন ওরফে শিপ্রা, এ ছবিতে তরুণ মজুমদারের দেয়া মহুয়া নামে আত্মপ্রকাশ করেন। সেদিন থেকেই টালিগঞ্জের চলচ্চিত্র মহলে একটি দুর্দান্ত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর জন্ম নিল। অনেকটা তরুণবাবুরই সৃষ্টি, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের মতো। মৌসুমীর বেগবতী প্রতিভা চালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি বেশিকাল কাজে লাগাতে পারেনি— মৌসুমী হয়ে গেলেন মুম্বইয়ের চলচ্চিত্র দুনিয়ার স্থায়ী অভিনেত্রী। অনেকটা শর্মিলা ঠাকুরের মতো। কিন্তু মহুয়া গোড়া থেকেই চিরকালের টালিগঞ্জের নায়িকা। পরিচালক তপন সিনহার 'আদমী আউর আউরত' ছবিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সমস্ত বিদগ্ধজনের মনে অসম্ভব প্রতিভাময়ী নায়িকা তথা অভিনেত্রী হিসাবে রেখাপাত করেছিলেন। শুধুমাত্র তাই নয়— জাতীয় শ্রেষ্ঠ নায়িকা নির্বাচনে শাবানা আজমির সঙ্গে দারুণ প্রতিযোগিতা করে মাত্র কয়েক পয়েন্ট-এর জন্য সেই অমূল্য সম্মানের অধিকারী হতে পারেননি। তবে মহুয়া যে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে অনন্য প্রতিভাময়ীরূপে শীঘ্রই অনেকের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রমাণ, তিনি উপরোক্ত চিত্রের মাধ্যমে একপ্রকার জানান দিয়েছিলেন। কিন্তু শুরুতেই বিপত্তি, খ্যাতির চূড়ান্ত শিখার আহরণের পথেই এক আশ্চর্য দুর্ঘটনায় চলে গেলেন 'ফুল ফুটতে না ফুটতেই।'

ছোটোবেলায় কিন্তু মহুয়া ভাবতেই পারেনি, তিনি অদূর ভবিষ্যতে টালিগঞ্জের অন্যতম নায়িকা হিসাবে চিহ্নিত করেন। বরং নাচ, গান তাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করতো। বাবা নীলাঞ্জন রায়চৌধুরী স্বয়ং নাচে তালিম ছাড়াও উদয়শংকরের নাচের দলের সঙ্গে মহুয়া যুক্ত ছিলেন। মহুয়া রায়চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৭১ সালে। জন্মলগ্নের উজ্জ্বল মাধুর্যে ভরে গেল দর্শককুলের পিপাসু মন। মহুয়ার গন্ধ তাঁদের মাতাল করে তুললো। একের পর এক ছবিতে মহুয়া দর্শকদের মন ভরিয়ে দিয়েছিলেন তার বাস্তব অভিনয়ে বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন ধরনের অভিনয় কখনও চপল চঞ্চলা মনও ব্যক্তিময়ী, কখনও বা বাংলার গাঁয়ের মেয়ে— প্রতিটি চরিত্রই যেন বাঙালির নিজস্ব চোখে দেখা এই বাংলার মাটিতেই যেসব চরিত্রগুলির সৃষ্টি হয়েছে সেই চরিত্রের আনন্দ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা ইত্যাদি মহুয়ার আন্তরিক অভিনয় সমৃদ্ধি মহুয়া তড়তড়িয়ে উঠে এলেন বাঙালি দর্শকের অন্তরে। কিন্তু জোয়ারের পর আবার ভাঁটার টানে মহুয়া অকস্মাৎ নামতে লাগলেন। সেই সময়টা তাঁর বিবাহিত জীবন। ১৯৭৬ সালে বাল্যসঙ্গীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বাল্যসঙ্গী যিনি ছিলেন, তিনি হলেন মাস্টার তিলক ওরফে তিলক চক্রবর্তী। দু'জনে জুটি বেঁধে উত্তমকুমার অভিনীত 'আনন্দমেলা' ছবিতে অভিনয় করলেন।

তমালের জন্ম হলো। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক প্রশান্তি মিলল মহুয়ার জীবনে। কিন্তু মহুয়া সেই ছিপছিপে গড়নে হঠাৎ কিছু মেদের আধিক্য চোখে পড়ল, পাঁচটা বাঙ্গালি মেয়ের মতো বিবাহ-অন্তে মহুয়াও কিছুটা আলস্য বিলাসে মনে হয় শারীরিক গঠনের প্রতি উদাসীন হলেন। মহুয়া অভিনীত যে সমস্ত ছবিগুলি বাণিজ্যিকভাবে সফলতা পায়নি। সেগুলি হলো— 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'-এর সাফল্যে মহানায়কের দৃষ্টি পড়ল মহুয়ার উপর। তারই চেষ্টায় 'সেই চোখ' ছবিতে তিনি উত্তমকুমারের সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিন্তু 'সেই চোখ' ছবিটি বাণিজ্যিকভাবে অসফলতায় মহুয়াকে মহানায়কের বিপরীতে অভিনয়ে চুক্তিবদ্ধ করতে প্রযোজকদের মনে ভয় পাইয়ে দিল। তবে উত্তমকুমার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মহুয়ার অভিনয় প্রতিভার। তাই 'হার মানিনি' ছবিতে তিনি তাঁকে বেশ এক কঠিন চরিত্রে নির্বাচিত করেন। কিন্তু মহানায়কের অকাল মৃত্যুতে সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল। ■

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

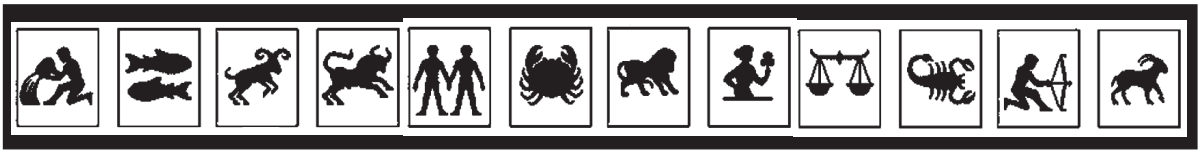

৩ নভেম্বর (সোমবার) থেকে ৯ ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, তুলায় শুক্র, বৃশ্চিকে রবি-বৃহস্পতি,বক্রী, ধনুতে শনি, মকরে কেতু, কুম্ভে মঙ্গল। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কন্যায় স্বাতী নক্ষত্র থেকে ধনুতে মূলা নক্ষত্রে।

মেষ : জ্ঞান-পাণ্ডিত্য, গৃহ-সম্পত্তি, বাহন-বাকপটুতা, ভ্রাতা, প্রতিবেশীর সম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধি। সপ্তাহের শেষভাগে মানসিক অস্থিরতা ও লাইফ পার্টনারের চিকিৎসার প্রয়োজন। ব্যবসায় সম্প্রসারণ, সন্তানের চাল-চলনে নেতিবাচক প্রভাব। দুরূহ কর্মে সাফল্য। শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রকাশক, প্রযুক্তিবিদের পেশাগত উন্নতি ও সুনাম।

বৃষ : পারিবারিক সদস্যের অসন্তোষ, মাতার স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগ, ছলনাময়ীর কুহকে রাহু কবলিত শশীর ন্যায় বিহ্বল চিত্ত। সপ্তাহের প্রান্তভাগে নিন্দার দাবানলে সুধাময় দৃষ্টির সপ্রতিভতা, বিদ্যার্থীর জ্ঞানের প্রসার, ভ্রাতা-ভগ্নীর নতুন কর্মলাভ। গৃহের সদস্যবৃদ্ধির যোগ।

মিথুন : কর্মে সাফল্য, শৌখিন ব্যবসায় নতুন উদ্যোগ, নিকট ভ্রমণ। সুহৃদের সম্পর্কে জীবনের নতুন দিশা। উন্নত রুচি ও সমবেদনায় ভরপুর মন। পিতা বা মাতুল সম্পর্কে চিন্তা বৃদ্ধি। দোদুল্যমানতা পরিহার ও জিনিসপত্র সাবধানে রাখুন। গৃহে শুভ অনুষ্ঠান ও দৈবী কৃপালাভ। চোখ ও দাঁতের চিকিৎসায় ব্যয়।

কর্কট : ক্রোধ-অবাঞ্ছিত মন্তব্যে অশান্তি। শান্ত-সংযত ও ধৈর্যের পরিমণ্ডলে চলতে হবে। বিসদৃশ আচরণ কটুবাক্যে সুসম্পর্কের অভাব ও শরীরের মধ্যভাগের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। সপ্তাহের শেষভাগে হঠাৎ প্রাপ্তি ও গুরুজনের পরামর্শে গৃহসুখ অর্থাৎ সন্তান ও লাইফ পার্টনারের সঙ্গে সুসম্পর্ক।

সিংহ : গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উন্নত রুচি, বস্ত্র ও অলংকার প্রাপ্তি। গবাদি পশু, উৎপাদিত ফসলে পেশাগত আনন্দ ও উন্নতি। সাংসারিক সুখ, সদ্ভাব, সার্বিক হৃদ্যতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। কনিষ্ঠ ভ্রাতার পদোন্নতি ও সন্তানের উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত। আর্থিক পরিকাঠামো সুদৃঢ় থাকবে।

কন্যা : সপ্তাহটি অবসাদ ও উৎসাহের মিশ্রফল যোগ। বাধার মধ্যেও বিদ্যা, কর্মে সাফল্য ও পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্তি। কর্মপ্রার্থীর নতুন কাজে যোগদান। গৃহকর্ত্রীর সূত্রে অর্থ প্রাপ্তি। গৃহে অতিথি সমাগম, সন্তানযোগ। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে শুভ। হঠাৎ বাসস্থান পরিবর্তন ও আর্থিক চাপ।

তুলা : বাড়ি, গাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার বিষয়ে অগ্রসর হতে পারেন। নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক কাজে আর্থিক সহযোগিতা। বিদ্যার্থী, ক্রীড়াবিদের স্বীকৃতি, পদক, অর্থ ও সম্মান লাভ। অগ্রজের উন্নতির সঙ্গে স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক। হৃদযন্ত্র ও বদহজম জনিত চিকিৎসার প্রয়োজন।

বৃশ্চিক : কর্ম ও দক্ষতার যথার্থ মূল্যায়ন। দানধ্যান, বিদেশ যাত্রা, বিত্ত ও অভিজাত বৃদ্ধি। পুত্র ও ভাল বন্ধু লাভ, কুলশ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি, পুলিশ, মিলিটারি, ক্রীড়াবিদের প্রত্যয়দীপ্ত পথচলা, বিজাতীয় সংস্পর্শ ও রমণীর সান্নিধ্যে লাভ। প্রবাসীর স্বদেশে প্রত্যাগমন।

ধনু : নিজ দক্ষতায় কর্তৃপক্ষের শংসা। ন্যায়-নীতিপরায়ণ, সাত্ত্বিক দৃষ্টিতে শ্রীবৃদ্ধি, সংস্কৃতি মনস্ক, বিশ্বস্ত ভৃত্য বা অধস্তন অনুগত কর্মচারী লাভ। লাইফ পার্টনারের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি ও কর্মলাভের সম্ভাবনা। সপ্তাহের শেষভাগে সন্তানের কারণে আইনঘটিত জটিলতা।

মকর : সপ্তাহের প্রথমভাগে সৎ-উদার-নীতিনিষ্ঠ-অনুভূতিশীল, স্বাধীনচেতা লোকসন্তুষ্টিতে ভরপুর মন তবে সাড়েসাতি জনিত আর্থিক সমস্যা ও ব্যবসায়ীর শ্রীবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। রমণীর বুদ্ধিমত্তায় গৃহের পরিবেশ ও দগ্ধ হৃদয়ে শীতলতার প্রলেপ যোগ।

কুম্ভ : শরীরের যত্ন নিন। বিদ্যার্থী, শিক্ষক, সাহিত্যিক, মঠাধীশ, গবেষকের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ, যশ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভ ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় স্বীকৃতি। পরিজন সমাবেশে শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান। সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তি। বিরোধী পক্ষের উৎপীড়নে বুদ্ধিমত্তায় পরিস্থিতি অনুধাবন করুন।

মীন : ন্যায়, সততা, সরলতায় পূর্ণ মূল্যায়ন নাও পেতে পারেন। চলাফেরায় সর্তকতা অবলম্বন জরুরি। পুত্র-কন্যা ও চাকরীজীবীদের মানসিক ও আর্থিক ভিত সুদৃঢ় হবে। সপ্তাহের শেষভাগে আইনঘটিত ঝামেলা ও ভ্রাতৃবিরোধে মানসিক অবসাদ। প্রেমিকের পূর্ণতা প্রাপ্তি।

• ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য